নো য়া খা লী জে লা

বুকে বিদ্ধ হয়ে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়

আমার আব্বু মো. আবুল হোসেন সরকার, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন একাডেমির প্রধান শিক্ষক। তার কাছ থেকে মুক্তিসংগ্রামের কথা শুনে শরীর শিউরে ওঠে। পাকহানাদার বাহিনী ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে গণহত্যা আরম্ভ হওয়ায় মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গ্রামের দিকে ধাবিত হয়। তৎকালীন ইপিআরসহ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকেরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে জড়ো হয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাকহানাদার, দেশের রাজাকার ও আলবদর বাহিনী বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে প্রবেশ করে হাজার হাজার মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে।

আমাদের গ্রামের পাশেই বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের বাড়ির নিকট নান্দিয়াপাড়া বাজার হতে সমগ্র নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। পাকহানাদার বাহিনী এ এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু নোয়াখালীর বাঘ নামে পরিচিত ক্যাপ্টেন লুৎফুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে পাকহানাদার বাহিনী আমাদের এলাকায় প্রবেশের সুযোগ পায়নি। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে পাকহানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের গ্রামের ওলিউল্যা বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তার সাথের যোদ্ধারা পেছনে চলে যাওয়ার পর তিনি একাকী যুদ্ধ করতে থাকেন। গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার পর পাকহানাদার বাহিনীর একটি গুলি তাঁর বুকে বিদ্ধ হয়ে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। হানাদার বাহিনী চলে যাওয়ার পর এলাকাবাসী সমবেত হয়ে তাঁর লাশ নিয়ে আসে। এই দৃশ্য দেখে এলাকায় মানুষের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। সে স্মৃতি আজও আব্বুর মনে জাগরিত।

যে কারণে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের মানুষ আজও সেই অর্থনৈতিক মুক্তি পায়নি। আজও পদে পদে মানবতা ও মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আজও সর্বত্র হাহাকার ও সাধারণ মানুষের নির্যাতন চলছে। এগুলোর সমাধান হওয়া প্রয়োজন বলে আব্বু মনে করেন।

সূত্র: জ-১৯২১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সালমা সুলতানা	**মো. আবুল হোসেন সরকার**
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন একাডেমি	প্রধান শিক্ষক
শ্রেণি: দশম	বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন একাডেমি
	সম্পর্ক : আব্বু

কলাগাছে গুলিবিদ্ধ হয় না

গজারিয়া পুল পর্যন্ত মিলিটারিরা এসে গেছে, এই কথা যখন সবার কানে গেল তখন সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। একে অপরকে বলে, এবার বুঝি আমাদের জীবন হারাতে হবে। মুক্তিবাহিনীকে তারা লাঠি, বল্লম, তীর এগুলো তৈরি করে দিত, যাতে তারা শত্রুকে প্রতিহত করতে পারে। তখন তাদের ধারণা ছিল কলাগাছে গুলিবিদ্ধ হয় না। তাই তারা তাদের ঘরের চারপাশে অর্থাৎ ঘরের নিচে যেখানে ফাঁকা আছে সেখানে কলাগাছ কেটে রাখত। আর ওই কলাগাছ বরাবর তাদের সন্তানদের রাখত যদি গুলির হাত থেকে বাঁচা যায়। তখন শুধু গুলির শব্দ শোনা যায়। হঠাৎ একটা গুলি এসে গোয়াল ঘরের গরুর খাবারের পাত্রে আঘাত করল। নানুর চাচি কী পড়েছে দেখতে গিয়ে ঘর থেকে মাথাটা একটু বের করার সাথে সাথে আর একটা গুলি এসে তার মাথায় বিদ্ধ হলো। সাথে সাথে তিনি মাটিতে গড়িয়ে পড়ে কাতরাতে কাতরাতে মারা গেলেন। আমার নানু কী করবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এভাবে আরো কত শত শত মানুষ দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমাদের এই দেশ।

সূত্র: জ-১৯৩১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সারমিন সুলতানা	**ছকিনা বেগম**
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন একাডেমী	জেলা : নোয়াখালী
দশম শ্রেণি, রোল : ৫	বয়স : ৫৫ বছর

বাগপাঁচড়া গ্রামকে নাম দিয়েছে কসাইখানা

১৯৭১ সালে আমার বাবার বয়স ছিল ৭-৮ বছর। তিনি আমার দাদার সঙ্গে দুপুর ১২টার দিকে গরুর ঘাস সংগ্রহ করতে যান। হঠাৎ পূর্ব দিক থেকে গজারিয়া গ্রামে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যায়। কিছু সময়ের মধ্যে ওই গ্রাম ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে। বাবা আমার দাদাকে বললেন, চলো আমরা বাড়ি চলে যাই। ওনারা দুইজন বাড়িতে চলে এলেন। এদিকে তুমুল যুদ্ধ চলছে। বাবা ছিলেন একমাত্র সন্তান। ছেলেকে বাঁচাবার জন্য আমার দাদা ও দাদু ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ছেলের চার পাশে কাঁথা টাঙিয়ে দিলেন। না খেয়ে না ঘুমিয়ে সারা দিন-রাত কাটিয়ে দিলেন। পরদিন সকালে দাদু আমার বাবাকে নিয়ে বন্যার পানিতে ডুবুডুবু অবস্থায় ওনার বাপের বাড়ি শামারবিল গ্রামে আশ্রয় নেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন আরও বাড়ছে। খেতে বসা মাত্র একটা বোমা এসে পড়ল বাড়ির উঠানের মাঝখানে। ধোঁয়ায় সমস্ত বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। লোকজন ছোটাছুটি করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আর একটি বোমা পড়ল একটা ঘরে। উপায়ান্তর না দেখে খাওয়া রেখে সবাই আশ্রয় নিল পাশের এক দরবেশ সাহেবের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে দেখে সমস্ত বাড়ির মানুষজন এক ঘরে বসে দোয়া দরুদ পড়ছে। দরবেশ সাহেব উচ্চস্বরে বলছে যে, তোরা ভয় করবি না, চিন্তা করবি না, এদিকে হানাদারবাহিনী আসতে পারবে না, জ্বলেপুড়ে মরবে।

এদিকে আমার দাদু ও বাবা তিন দিনের উপবাস। ভয়ে কোনো খাবার খাননি। তারা এর ফলে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কোনো উপায় না দেখে তারা আবার নিজ গ্রাম বাগপাঁচড়া ফিরে আসেন। বাগপাঁচড়া গ্রামকে মানুষ কসাইখানা নাম দিয়েছে, কারণ এই গ্রামে হানাদারবাহিনী ঢুকতে পারত না, এখানে মুক্তিযুদ্ধের একটা ঘাঁটি ছিল। এ খবর হানাদারবাহিনীর নিকট পৌঁছে গেলে তারা গজারিয়া ব্রিজের নিকটে মেশিনগান ও ভারি অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হল, উদ্দেশ্য এই গ্রামকে তামা করে দিবে। এই খবর কমান্ডার লুৎফুর রহমানের নিকট পৌঁছা মাত্র তিনি তিন দিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সমস্ত পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল। যুদ্ধে তারা সবাই মারা পড়ল এবং মেশিনগান ও ভারি অস্ত্র খালে পড়ে গেল। তারা আর বাগপাঁচড়া গ্রামে আসতে পারল না। আমরা সবাই নিরাপদে রইলাম।

সূত্র: জ-১৯৯৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মোঃ জাকির হোসেন ভুঁইয়া	**মো. আনোয়ার হোসেন ভুঁইয়া**
বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন একাডেমী	গ্রাম : বাগপাঁচরা, ডাক : নান্দিয়াপাড়া
সপ্তম শ্রেণি, রোল : ০১	থানা : সোনাইমুড়ী, জেলা : নোয়াখালী
	বয়স : ৪২, সম্পর্ক : বাবা

দরজার সামনে টিন দিয়ে রাখেন

আমার বাবা গোলাম রহমান তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র ছিলেন। আমার দাদার ছিল তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। যখন সোনাইমুড়ী গোলাগুলি হচ্ছে তখন আমার বাবা ও দাদা তাদের ঘরের দরজার সামনে টিন দিয়ে রাখেন। যাতে করে পাকিস্তানিরা এলে বুঝতে পারে বাড়িতে কেউ নেই। তারপরে তারা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বসেছিলো কিছুক্ষণ। পরে টিনে লাথি মারলে তারা বুঝতে পারে যে, পাকিস্তানিরা এসেছে। তখন আমার দাদা তিন ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পাশের পুকুরে নেমে যান। পাকিস্তানিরা চলে গেলে তারা

ওঠে দৌড়াতে দৌড়াতে এক জঙ্গলের ভিতর গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে গিয়ে দাদি রুটি বানিয়ে ছেলেমেয়েদের হাতে দিলো। তারা খাবেন এমন সময় একটি গুলি এসে দাদির মাথায় না লেগে কলা গাছে আটকে গেল। তখন তারা ভয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন।

এরপর যখন বিমান-যুদ্ধ হলো তখন একটি চিকন ধারালো ও মাথা মোটা লোহার বস্তু এসে ঘরের টিন ছিদ্র করে মাটিতে পড়লো। ভয়ে আমরা ঘর ছেড়ে পালাতে লাগলাম। তখন আমার দূরসম্পর্কের এক চাচা আমাদের আশ্রয় দিল। তারা খাবার দেয় না। না দিলেও আমরা তাদের কাজে সহযোগিতা করি। যখন পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে তখন আমরা গর্তের ভিতর ঢুকে পড়ি, গুলি বন্ধ হলে বের হয়ে আসি। এভাবে দুঃখ-কষ্ট করে আমরা আমাদের জীবন বাঁচিয়েছি।

একদিন দেশ স্বাধীন হলো। আমরা মুক্ত ও স্বাধীন জীবনে ফিরে গেলাম।

সূত্র: জ-২০১৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
অয়েশা আক্তার আলো	**গোলাম রহমান**
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন একাডেমী	গ্রাম : ডুমুরিয়া মোল্লাবাড়ি
৭ম শ্রেণি, রোল : ৮	বয়স : ৬০

তারা আমাদের গ্রামের গর্ব

আমি বদলকোট গ্রামের অধিবাসী। তখন আমি ৭ম শ্রেণিতে পড়ি। ১৯৭১ সাল। সারা দেশে উত্তাল জনগণ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সারা দেশে অতর্কিত হামলা করেছে দেশের নিরীহ জনগণের উপর। পাকিস্তানিরা প্রথমে শহর, এরপর আস্তে আস্তে গ্রামের দিকে আক্রমণ চালাতে লাগল। গ্রামের অনেক লোক একথা শুনে সচেতন হয়ে গেল। তারা গ্রামের জনগণকে হানাদার বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানায়। আমার চাচাত ভাই বশীর আহমেদ চৌধুরী, মামাত ভাই নজীব উল্ল্যাহ, খালাত ভাই বকুল, বোনের ছেলে মাহবুবুর রহমান, বদলকোট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক আবুল বাশার চৌধুরী, এ ছাড়াও গ্রামের আরও অনেক কৃতি ও সাহসী ব্যক্তি এই গ্রামের জনগণকে পাকবাহিনীর হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধের ট্রেনিং নিল। তারপর গ্রামে এসে পাকবাহিনীকে দমন করার সকল ব্যবস্থা করে রাখল। পাকবাহিনী আমাদের চাটখিলের বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালাল। তখন চাটখিলের টবগাঁও এলাকার সাবেক সংসদ সদস্য সালেহ উদ্দিন কামরান সাহেবের পিতা রুহুল আমিন উকিল তাদের পক্ষে যোগ দেয়। সেই সুবাদে পাকিস্তানী বাহিনী চাটখিল এলাকায় গমন করে। তারা বদলকোট ও বিভিন্ন এলাকায় আসার পরিকল্পনা করে। কিন্তু আমাদের বদলকোট গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের বিচরণ ছিল বেশি। এখানে মুক্তিবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই গ্রামের মানুষ অত্যন্ত সাহসী ও শিক্ষিত। এই গ্রামে যেন পাকিস্তানিরা ঢুকতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা। পাক বাহিনী মুক্তিবাহিনীর শক্ত ব্যবস্থা দেখে এই গ্রামে ঢুকতে সাহস পায়নি। ফলে এই গ্রামের মুক্তিবাহিনী অন্যান্য স্থানে যুদ্ধ করতে চলে যায়। পাকিস্তানীরা যাতে অন্যান্য গ্রামে যেতে না পারে সে জন্য ১১ নং ব্রিজ ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এ দিকে পাকিস্তানিরা কোনো গ্রামে ঢুকতে না পেরে চাটখিল সরকারি কলেজের পাশে ক্যাম্প করতে উদ্যত হয়। কিন্তু এখানকার মুক্তিবাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করে এবং উচ্ছেদ করে। এরপর দিনই তারা এই চাটখিল থেকে পালিয়ে সোনাইমুড়িতে প্রত্যাগমন করে। এভাবে আমাদের গ্রামের লোকজন পাকবাহিনীর হাত থেকে নিস্তার লাভ করে।

বদলকোট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এই কারণে রাজাকাররা পাকিস্তানীদেরকে বিষয়টি অবগত করে। তখন পাকবাহিনী তাঁর নিজ বাড়ি বাট্টা মজুমদার বাড়িতে আক্রমণ করে। তাঁর ঘরবাড়ি সব আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।
এ ছাড়াও অনেকে যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তারা আমাদের গ্রামের গর্ব।

সূত্রঃ জ-৩৪২৫

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
তানজিনা চৌধুরী নিতু	**আজিজুল বাসার চৌধুরী**
বদলকোট উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: বদলকোর্ট
দশম শ্রেণি, বিজ্ঞান, রোল : ০১	উপজেলা : চাটখিল, নোয়াখালী
	বয়স : ৫০, সম্পর্ক : বাবা

হৃদয় হাহাকার করে ওঠে

আমি এ ঘটনা আমার মায়ের কাছ থেকে শুনেছি। তারা তখন বেনাপোলে থাকতেন। আমার নানা ছিলেন একজন কাস্টম অফিসার। মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা ভারত চলে যান। আমার মায়ের এক চাচা কুষ্টিয়ায় চাকরি করতেন। তিনিও কাস্টমস অফিসার ছিলেন। তার পালিয়ে যাওয়ার কোনো পথ ছিল না। আমার মায়ের সে চাচার নাম ছিল মোঃ ফজলে আহমদ। তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ঘোর পাকিস্তানি দালাল। মো. ফজলে আহমদের সাথে তার একমাত্র ছেলে কবির কুষ্টিয়ায় একটি বাসায় থাকতেন। ১৯৭১ সালে তিনি এবং তার ছেলে কবির যখন খুব বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তখন তারা দুইজনেই তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তার কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছিলেন। প্রধান কর্মকর্তা সেই পাকিস্তানি দালাল তাদেরকে বলে, তোমরা নিশ্চিন্তে থাক। তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না। সে আরও বলে পাঞ্জাবীরা যখন আসবে তখন তোমরা বলবে যে আমরা মুসলমান এবং বাঙালি। পাঞ্জাবীরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না এবং আমরাও তোমাদের পাশে থাকবো। এ সকল কথা বলে সেই প্রতারক পাকিস্তানি দালাল মো. ফজলে আহমদ এবং তার ছেলেকে বাসায় পাঠিয়ে দেয়।
তাঁরা দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত সরল ও সাদাসিদে মানুষ। তারপর যখন পাঞ্জাবীরা আসল তখন ওরা দুজনেই বলে উঠল যে, আমরা বাঙালি এবং মুসলমান। মোঃ ফজলে আহমদ এবং তার ছেলে কবিরের কথা শুনে মিলিটারিরা তাদেরকে বলল, তোমরা কলেমা পড়। তখন ফজলে আহমদ এবং তার ছেলে কলেমা পড়া শুরু করল। আর এ সুযোগেই মিলিটারিরা গুলি চালাতে প্রস্তুত হলো। তখন তারা দুজনেই তাদের জীবন রক্ষার জন্য দৌড়ে গিয়ে সেই প্রধান কর্তার বাড়িতে পৌঁছেন এবং পায়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করলেন। কিন্তু সেই রাজাকারের মধ্যে কোনো দয়ামায়া ছিল না। সে ফজলে আহমদ এবং তার ছেলে কবিরকে মিলিটারিদের হাতে তুলে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারিরা তাদের গুলি করে হত্যা করে।
সেই ঘটনা আজও আমার মায়ের হৃদয়ে গাঁথা আছে। আমার মা অত্যন্ত দুঃখের সাথে এ কথাগুলো আমার কাছে বলেছেন। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এই কথাগুলো শুনে আমার হৃদয় হাহাকার করে ওঠে।

সূত্রঃ জ-৩৪৩৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সায়েরা খাতুন (রুমি)	**জাহানারা বেগম (স্বপ্না)**
বদলকোট উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : মা

যেটা হলো ননী চেয়ারম্যান

আমার নানার বাড়ির সামনে এবং একটু দূরে কাঁঠাল বাগানের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজাকারদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হতো। রাজাকারদের প্রধান ছিল এক নর পিশাচ ননী চেয়ারম্যান। নিজের দেশের ভাত মাছ খেয়ে, নিজ দেশের আলো বাতাসে বড় হয়ে নিজের গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে তার কালো হাতের ছোবল বসাত। সে পাকিস্তানিদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে একের পর এক কুকর্ম চালিয়ে যেতে শুরু করল। কত মায়ের কোল যে খালি করেছে তার কোনো হিসাব নেই।

একদিন আমার আম্মার মামা ও মামাতো ভাই ঘরে বসে ভাত খাচ্ছিল। তখন রাজাকারের দল এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়। ঘরের অন্যান্য সদস্যরা চিৎকার করতে করতে তাদের পিছু নেয়। আমার আম্মার নানি কাঁদে আর বলে, আমার ছেলের কোনো দোষ নেই, তোমরা আমার ছেলে-নাতিকে ছেড়ে দাও তোমাদের দোহাই লাগে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? আস্তানায় নিয়ে রাজাকাররা তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। শুধু তাই নয়, ননী চেয়ারম্যান তার দলবলসহ গ্রামের মধ্যে একের পর এক অপারেশন চালিয়ে যেতে আরম্ভ করল। তার ভয়ে মানুষ ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তবু যেখানে যাকে পেত তাকে সেখানে গুলি করত। বাড়ি থেকে মেয়েদের তুলে নিয়ে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করত। আমার আম্মা তখন ছিল সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী। তারা কয়েকজন মিলে দিন হলে লুকিয়ে থাকত। সবাই যখন এসব পশুদের কথা বলাবলি করত তখন তাদের ভয় লাগত।

এসব হত্যাকাণ্ড সহ্য করতে না পেরে এলাকার মানুষ সিদ্ধান্ত নিল যে, রাজাকারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সকলে ননী চেয়ারম্যানের পিছু লাগল। একদিন ননী চেয়ারম্যানের স্ত্রী তাকে মানুষ হত্যার কাজ বন্ধ করতে অনুরোধ ও কাকুতি মিনতি করল। কিন্তু এতে কোনো লাভ হয় না। তখন সবাই মিলে ননী চেয়ারম্যানকে খোঁজাখুঁজি শুরু করল এবং যে ব্যক্তি তাকে জীবিত ধরে দিতে পারবে তার জন্য উপযুক্ত পুরস্কারের ঘোষণা করা হলো। মুক্তিযোদ্ধারা শুরু করল রাজাকারদের বিরুদ্ধে গুলি বিনিময়। সবাই একটা টার্গেট নিয়ে যুদ্ধ শুরু করল। সেটা হলো ননী চেয়ারম্যান। একদিন যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন ননী চেয়ারম্যান লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা অবস্থায় তার রাজাকার দলের সাথে যুদ্ধ শুরু করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর গুলি চালানো শুরু করে। নারকেল গাছ ও আমগাছের এক কোণে বসে সে গুলি চালাচ্ছিল। হঠাৎ একটি গুলি এসে ননী চেয়ারম্যানের গায়ে লাগে এবং সে মারা যায়। মুক্তিযোদ্ধারা জানতো না যে এখানে ননী চেয়ারম্যান আছে। জানলে তাকে গুলি করত না। কারণ সবার ইচ্ছে ছিল তাকে জীবিত অবস্থায় ধরে শাস্তি দেবে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আমার চাচা ও পাশের বাড়ির একজন ছিল। তারাসহ সকলে সিদ্ধান্ত নিল যে, ননী চেয়ারম্যানকে বড় বাঁশের মাথায় বেঁধে তিন রাস্তার মোড়ে রাখা হবে যাতে সবাই তাকে দেখতে পায়। যে কথা সেই কাজ। সবাই তাকে মৃত দেখার পর স্বস্তির নিশ্বাস নিল।

আমার বাবাকে একদিন রাজাকাররা চোখ বেঁধে তাদের আস্তানায় নিয়ে যায়। তাদের সবাই মিলে বলাবলি শুরু করল মারবে কি মারবে না। ভাগ্যক্রমে আমার বাবা সেখান থেকে মুক্তি পায়। আমার এক নানা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি এখন বেঁচে নেই। প্রচণ্ড সাহসিকতার সাথে তিনি রাজাকারবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতেন এবং অনেককে হত্যা করেন।

সূত্র: জ-৩৫৭৭

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
উম্মে সালমা (পপি)	**ফেরদাউস বেগম**
বদলকোট উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: বদলকোট, থানা : চাটখিল
অষ্টম শ্রেণি, রোল : ২০৬, শাখা : খ	নোয়াখালী
	বয়স : ৪৬, সম্পর্ক : মা

তাদের কথা ভোলা যায়না

আমার বয়স তখন ৪৫ বছর। স্বামী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গ্রামে বাস করি। ১৯৭১ সাল, জ্যৈষ্ঠের আগুন ঝরা দিন। এইটুকু মনে আছে। চারদিকে মাঠ ঘাটে ফসল তোলা চলছে। কিন্তু মানুষ আনন্দহীন। আতঙ্কের মধ্যে সবাই দিন যাপন করছে। আমার তখন খুব ভয় লাগত। মনে হত চারদিকে শত্রু ঘিরে ফেলেছে। ছেলে মেয়েদের নিয়ে কী করবো, কোথায় যাব যদি আমাদের বাড়িতে শত্রু হানা দেয়? এই ভয়ে খাওয়া দাওয়া ঘুম প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার স্বামী মো. ইদ্রিস মিয়া ছিল অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। চাকরি ছেড়ে অবসর সময়ে আমার স্বামী কৃষি কাজ করে। যেটুকু জমি ছিল সেখানে পরিশ্রম করে চাষ করে ধান, মুগ ডাল, খেসারি ডাল, মরিচ ইত্যাদি ফসল। ঘরে ছিল বাগান থেকে পেড়ে আনা অনেক সুপারি। মাঠে ছিল ১০ জন কামলা। এরই মাঝে বারবার চারদিক থেকে মানুষের আর্তচিৎকার ভেসে আসে।

পাকিস্তানি ঘাতক হানাদার বাহিনী এদিকে আসছে। তখন ঘরে যা কিছু ছিল থালা-বাসন সমস্ত জিনিস বাগানে গর্ত করে বা পুকুরের পানির নিচে লুকিয়ে রাখতাম। তারপর যখন দেখি ঘাতকরা আসছে না আবার ঘরে ফিরে আসতাম। এভাবে দিন চলতে থাকে। এদিকে শুনতে পাই ঢাকায় সব মানুষ মেরে ফেলেছে, সব কিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ অবস্থায় ছয় ছেলে দুই মেয়ে, স্বামীকে নিয়ে কী করবো ভেবে পাই না। ছেলেরা কেউ ঢাকায়, কেউ চৌমুহনী পড়ে। না জানি কখন কি ঘটে যায়। দেশের মানুষ প্রাণের ভয়ে, ইজ্জতের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এক সময় ঘাতকরা আমাদের স্কুলের সামনে ক্যাম্প গড়ে তোলে।

তাদের আগমন শুনে আমার স্বামী ইদ্রিস মিয়া, আমার ছেলে আব্দুল মোতালেব, আব্দুল ওহাব, আব্দুল খালেক, গোলাম মোস্তফা, আনোয়ার হোসেন, মাজহারুল ইসলাম এবং বড় মেয়ে আয়শা বেগম জাহানারা, ছোট মেয়ে রাবেয়া বেগম রুনু কেউ বাড়িতে ছিল, কেউ ছিল না। আমরা সবাই ছোটাছুটি করতে লাগলাম। আমার স্বামী ও আমরা কোথায় গেলাম হুঁশ ছিল না। এই ফাঁকে আমার স্বামী বাড়ির দলিল নিয়ে কোন দিকে গেল, ছেলেরা কোন দিকে গেল দেখতে পাইনি। আমি আমার ছোট ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে দৌড়ে বের হয়ে গেলাম।

বাড়ি থেকে বের হবার পর আমরা দূরে এক গাছের নিচে বসে পড়ি। হঠাৎ আমার ছেলে আব্দুল ওহাবের বন্ধু বেলাল আমাদের দেখতে পায়। সে আমাদের তার নানার বাড়ি নিয়ে যায়। দুপুরবেলা রোদে গরমে আমরা খুব অস্থির ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সেখানকার লোকজন তাদের উঠানে পাটি বিছিয়ে বসতে দিয়ে বাতাস করতে থাকে। তারপর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে। খাওয়ার ইচ্ছে নেই কারণ আমার ছেলেরা কোথায় কী অবস্থায় আছে, স্বামীর কী অবস্থা এই ভেবে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তারা আমাদের কোনরকম খাওয়ালেন। এভাবে রাত প্রায় ১১/১২টা বেজে গেল। বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসতে সকাল হয়ে গেল। ওই বাড়ির লোকজন আসতে দিচ্ছিল না, তবু আসতে হলো। তাদের এই ঋণের কথা কখনও ভোলার নয়।

বাড়িতে আরেক করুণ দৃশ্য। দেখি, ঘর দুয়ার, গাছ-পালা, পশু-পাখি পর্যন্ত জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে আছে। তারপর জানতে পারি রাজাকাররা ভালো ভালো জিনিসগুলো নিয়ে বাকি সব জিনিসপত্র জ্বালিয়ে দেয়। এসব দেখে সবার কান্নাকাটি শুরু হলো। এত কষ্টের জিনিসগুলো ঘাতকরা কীভাবে শেষ করে দিল। বাড়ির অন্যান্য ঘরের মানুষও ফিরে আসে। কিন্তু এ কোথায় আসলো? সবার মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এলো। আমার ছেলে-স্বামীও বাড়িতে ফিরে আসে। শুরু হলো আমাদের কষ্টের জীবন। আমাদের তখন মাটি ছাড়া সম্পদ বলতে কিছু ছিল না। কী করবো, কীভাবে চলবো, এই ভাবনায় তখন দিশেহারা হয়ে পড়ি। আমার স্বামী ছেলেরা দিনে বাড়িতে আসতো ও রাতে পালিয়ে থাকত।

স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জন্য হাঁড়ি-পাতিল, আতপ চাল, আটা-বিস্কুট গুঁড়ো দুধ পাঠায়। রুটি বানানোর জন্য একটা কলাপাতা নিয়ে সেখানে আটা গুলি। বাগান থেকে কয়েকটা ইট নিয়ে চুলা, একটুকরো টিনের উপরে হাতের তালুতে চাপা দিয়ে রুটি বানাই। এভাবে অনেক কষ্টে দিন যাপন করি। জামা কাপড় ছিল

না। বাসস্থান ছিল না। শেখ মুজিব তারপর আমাদের টিন দেয়। এভাবে আমরা আরও অনেক না বলা কষ্টে দিন অতিবাহিত করি যা বলে শেষ করা যাবে না।

সূত্র: জ-৭৬৬৯

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মো. আশরাফুল ইসলাম	**আঞ্জুমা খাতুন**
চাটখিল পাঁচগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : নোয়াখলা, ডাক: সোনাচাকা
শ্রেণি: ৭ম, রোল : ৬১	থানা : চাটখিল, জেলা : নোয়াখালী
	বয়স : ৭০ বছর

রুমিকে হারাতে হলো

আমার দাদুর এক বোন ছিল রুমি। উনি সব সময় নীরব থাকতেন। কারো সাথে বেশি কথা বলার কোনো প্রয়োজন মনে করতেন না। কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তিনি কথা না বলে থাকতে পারেননি। আমার দাদুদের বাপের বাড়িতে পাকসেনারা ঢুকে অনেক মেয়েকে নির্যাতন করতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি কারণ তাদের বাড়ির অল্প দূরে ছিল একটি পাটক্ষেত। ক্ষেতটা ছিল আমার দাদুর বাবার। অনেকে সেই পাটক্ষেতে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু আমার বড় বাবা তাতে আশ্রয় নিতে প্রয়োজন মনে করতেন না। যার কারণে তার সুন্দরী মেয়ে রুমিকে হারাতে হলো। ঘটনাক্রমে সৈন্যরা সেই বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং দুইজন মেয়ের উপর নির্যাতন চালায়। প্রথমে রুমির বান্ধবী সানু। তারপর রুমি। পাকিস্তানিরা বাড়ি ঢুকেই সানুকে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় তার বাবা ওই লোকদের বাধা দিতে গেলে তাকে মেরে ফেলে। এটা দেখে রুমি চিৎকার করে উঠে দৌড়াতে থাকে। সৈন্যরা তাকে দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলে। ওরা জোর করে তাকে গাড়িতে করে নিয়ে যায়। তারপর তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আমার নানা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। কিছু দিন যুদ্ধ করে তিনি বাড়ি ফিরে এসে খেয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। এমন সময় সৈন্যরা দৌড়ে ঘরে ঢুকে আমার নানাকে ধরে ফেলে। আমার নানাকে তারা সহজে চিনল। কারণ তাদের উপর নানার দল হামলা চালিয়েছিল। তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল। আমার নানু তখন আলমারির আড়ালে আমার আম্মাকে কোলে নিয়ে সব দেখছিলেন। কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। যার কারণে আমার মা ছোটবেলা থেকে পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল। আমরা আমাদের এই স্বাধীন বাংলা কত কষ্ট করে পেয়েছি।

সূত্র: জ-৭৬৭০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
খাদিজাতুল কোবরা	**নুরজাহান বেগম**
চাটখিল পাঁচগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৭৭ বছর
শ্রেণি: ৮ম, রোল নং : ৬২	

এরাও আমার সন্তান

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি দিনাজপুরে কবিরাজহাট এলাকায় আমার বাবা-মায়ের সাথে ছিলাম। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেখলাম উত্তরবঙ্গের মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমার মা-বাবা আমাকে ও আমার ভাই-বোনদের নিয়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায় কবিরাজহাট এলাকা থেকে গোলাপগঞ্জের হিন্দু পাড়ায়। তখন আমরা তিন দিনের উপবাসী। একদিকে ক্ষুধার যন্ত্রণা আরেকদিকে স্বাধীনতার

সংগ্রাম। ওখানে দেখলাম বার চৌদ্দ বছরের যুবক থেকে শুরু করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে মুক্তিকামী সেনাবাহিনীর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে।

ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন ছটফট করতে শুরু করি, তখন আমার বাবা এক হিন্দু বাড়িতে গিয়ে চাল কিনতে চাইল কিন্তু তারা বিনা পয়সায় প্রায় এক মণ চাল দিয়ে দিল। মা ভাত পাক করার পর রাত ১০ টার দিকে যখন খেতে বসলাম তখন দেখলাম এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। চৌদ্দ পনের জন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটু পানি পান করার জন্য আমরা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানে এসেছে। মা তখন আমাদেরকে অল্প চারটা ভাত ও ভাতের মাড় দিয়ে বাকি ভাত মুক্তিযোদ্ধাদের খেতে দিল। আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদেরকে পেট ভর্তি ভাত না দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্ত ভাতগুলো দিয়ে দিলেন কেন? মা তখন কান্নাভরা চোখে হেসে বললেন, এরাও আমার সন্তান। আমার বড় ছেলে হারুন দশম শ্রেণির ছাত্র। সে নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু তাকে তো আমি চোখে দেখছি না। সে আছে কি না মারা গেছে তাও জানি না। এখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে ভাবলাম, এরাই আমার হারুন। এখানে প্রায় তিন মাস আমরা অবস্থান করলাম।

জুলাই মাসের শেষের দিকে পাকহানাদার বাহিনী গোপালগঞ্জ এলাকা ঘিরে ফেলে। তখন প্রাণের ভয়ে আমরা এখান থেকে পালিয়ে দেবীগঞ্জে চলে যাই। দেবীগঞ্জে গিয়ে দেখলাম কিছু সংখ্যক রাজাকার, আলবদর পাক সৈন্যদের সাথে হাত মিলিয়ে মানুষের সম্পদ লুট করছে আর মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করছে। দেবীগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধারা তরুণ জগলুর নেতৃত্বে হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করে। এতে শুরু হয় দুপক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়। আমি তখন মাকে ফাঁকি দিয়ে মুক্তিবাহিনীর সাথে চলে যাই। মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করতে করতে পাকহানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের পরাজিত করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার জুয়েলের বুকে হঠাৎ করে পাকহানাদার বাহিনীর গুলি লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। আমরা তাকে এক মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করি।

জুয়েলের এই আত্মত্যাগ আজও আমাকে ১৯৭১ সালের রক্তঝরা দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সূত্র: জ-২০৪৪

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
আরমান হোসেন	**মো. নাছির উদ্দন**
চাটখিল পাঁচগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স: ৪৪ বছর
৬ষ্ঠ শ্রেণি	

জম্ভি কাড হ্যায়

১৯৭১ সালের ১৫ জুন নোয়াখালীর পশ্চিম অংশের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সুবেদার লুৎফর রহমান আমাদের স্কুলে স্বাধীনতাকামী মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের এক গোপন মিটিং ডাকেন। ভারত থেকে আসা এক গোপন সংবাদ ঢাকায় পৌঁছানো এবং সেখান থেকে সংবাদ নিয়ে ফিরে আসার দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে। এই সংবাদ নিয়ে ধরা পড়লে মৃত্যু অবধারিত; তাই চাটখিল বাজারের মুচি দিয়ে আমার জুতার সোল কাটিয়ে বিশেষ ভাবে এই সংবাদের কাগজটা সেলাই করিয়ে নেই। ২১ জুন সকাল বেলায় পাল্লা থেকে সুচিয়পাড়া ঘাট পার হয়ে মেহের কালীবাড়ী যাওয়ার জন্য রিকসায় উঠি। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা যায় আগের রিকসাগুলি দ্রুত আবার সুচিয়াপাড়ার দিকে ফিরে যাচ্ছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। আমি ও রিকসাওয়ালা এ অবস্থায় শঙ্কিত হয়ে পড়ি। হঠাৎ সামনেই দেখি প্রায় ৭০/৮০ জন পাকসেনা। তখন পিছনে গেলেও গুলি করতে পারে ভেবে আল্লাহকে স্মরণ করে বললাম, সামনে চালাও।

আমাদের রিকসা উত্তর দিকে যাচ্ছে। দক্ষিণ দিকে রাস্তার পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মিলিটারি। তখন আমার নিজের মধ্যে প্রাণ ছিল কিনা জানি না। আমাদের রিকসাটা পাকসেনাদের শেষ মাথা অতিক্রম করার সময় এক মিলিটারি রিকসা দাঁড়াতে বলে। ঠিক তখন অন্য একজন তাদের ভাষায় বলে, যাও। তারপর মেহের কালীবাড়ি গিয়ে বাসে চাঁদপুর থেকে লঞ্চে ঢাকার সদরঘাট পৌঁছাই। পরে রিকসা করে গোপীবাগ রওনা হই। পথে বাহারদুর শাহ পার্কের কাছে পাকসেনা আমার রিকসা থামায়। আমাকে নামিয়ে সারা শরীর চেক করে ও বসিয়ে রাখে। প্রায় ৩০ মিনিট রাখার পর ওদের একজন অফিসার জিপে করে ওই চেক পোস্টে আসে। তারপর সেনাদেরকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে ও অন্যদেরকে কেন বসিয়ে রেখেছে? তখন তারা বলে, মুক্তি সন্দেহে আমাদেরকে বসিয়ে রেখেছে। তখন ওই অফিসার আমাদেরকে গাড়িতে উঠতে বলে। শেষ চেষ্টা হিসেবে আমি উর্দু এবং বাংলা মিশিয়ে বলি, আমি মুক্তি নই। আমি অফিসের কাজে বাদামতলী ঘাটে গিয়েছিলাম। এখন অফিসে ফিরে যাচ্ছি। এটা বলার পর অফিসার বলে, ডান্ডি কার্ড হায়? তখন আমার অফিসের পুরানো কার্ডটি দেখালে সে বলে, সরি আপ যাইয়ে। সেখান থেকে রিকশা নিয়ে গোপীবাগ পৌঁছাই।

পরদিন সকালে ওই নির্দিষ্ট ঠিকানায় সংবাদটি নিয়ে যাই এবং আমাকে বলা হয় দুই দিন পরে সেখানে আবার যাওয়ার জন্য। দুইদিন পরে গিয়ে সেখান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে নোয়াখালীতে ফিরে আসি এবং লুৎফর রহমানের কাছে পৌঁছে দিই।

সূত্র: জ-২০৬৫

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মো: মাহিনুর আক্তার	**গোলাম মোস্তফা আলম**
চাটখিল পাঁচগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৫০ বছর
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, রোল নং : ৭৩	

রাস্তায় অনেক মৃত দেহ পড়েছিল

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাক বাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে আমরা ভারতে গিয়েছিলাম। যাওয়ার পথে তখন রাস্তায় অনেক মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। চট্টগ্রাম থেকে সীতাকুণ্ড যেতে সময় লেগেছিল চারদিন। সীতাকুণ্ড থেকে ত্রিপুরা যেতে সময় লেগেছিল সাতদিন। তখন কোন গাড়িঘোড়া ছিল না। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতের দিকে যাচ্ছিল। কেউ পানি খাওয়ার সময় পর্যন্ত পায়নি। শরণার্থী শিবিরে রিলিফ নিয়েছিলাম। আমরা যা দেখেছি কখনো ভোলার নয়। নয় মাস সপরিবারে শরণার্থী শিবিরে খুব কষ্টে ছিলাম। ভারত সরকার আমাদের রিলিফের ব্যবস্থা করেছিল, আমরা অসন্তুষ্ট ছিলাম না। তখন অনেক ছোট ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ মানুষ না খেয়ে এবং অসুখে মারা গিয়েছিল। আমরা সব সময় ভাবতাম দেশ কবে স্বাধীন হবে। কবে নিজের বাড়িতে ফিরব।

আমি ত্রিপুরার শান্তিনগরে ট্রাকের সহকারী হিসেবে কাজ করতাম। আমি বিভিন্ন মালামাল শিবিরে পৌঁছে দিতাম। এতে ভারত সরকার আমাকে রুপি দিত। এই রুপি দিয়ে অতিকষ্টে সংসার চলত। আমাকে মুক্তিযোদ্ধারা ইরিনা শিবিরে প্রশিক্ষণ নিতে বলেছিল। কিন্তু ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য আমি যেতে পারিনি। স্বাধীনতার পনেরো দিন পরে আমরা বাংলাদেশে চলে আসি। বাড়ি এসে দেখি যে, রাজাকারেরা সব লুট করে নিয়ে গিয়েছে। শুধু আমার না, সবার ঘরবাড়ি লুট করে নিয়েছিল।

সূত্র: জ-৫৮২৩

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
জনি কর্মকার	**অনিল কর্মকার**
সরকারি কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : কেদারখীল, ডাক: জাফর নগর
৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল নং : ৬০	থানা : সীতাকুন্ড, জেলা : চট্টগ্রাম
	বয়স : ৭০ বছর

দেশের সাথে বেঈমানী

১৯৭১ সালে যারা শুধু যুদ্ধ করতে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারাই নয়, এদেশের সাত কোটি বাঙালি এক একজন বীর সৈনিক, কেউ বুদ্ধি দিয়ে, কেউ খাদ্য দিয়ে, কেউ আশ্রয় দিয়ে, কেউ তথ্য দিয়ে যদি সেদিন সাহায্য না করত তবে সোনার বাংলা আজ আর সোনার আলোয় ঝলমল করার সুযোগ পেত না। আমার নানুর মুখে শোনা পরিবারের সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি ছিল গোলাম সারোয়ার।

তিনি আমার নানুর জ্যাঠাত ভাই। তিনি ছিলেন কৃষক লীগের একজন বড় কর্মী। তার পদ সম্পর্কে আমার নানুর তেমন ধারণা ছিল না। তবে সে সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তার ভাল সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনা তাকে চাচা বলে সম্বোধন করতেন। আমার নানা গোলাম সারোয়ার ১৯৭১ সালে এদেশ থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে লোক নিয়ে ভারতে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিতেন। নদী, খাল, আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে কখনো প্রয়োজনে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে নদী পথে লোক ভারত নিয়ে যেতেন। একবার শত্রুদের কবলে পড়লে তিনি পানির মধ্যে কচুরিপানার নিচে লুকিয়ে কোন মতে রক্ষা পান। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য ও অস্ত্র সরবরাহ করতেন।

গোলাম সারোয়ার দেশের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন বলে ২০০৪ সালে তার মৃত্যুর পর সরকার এবং জনগণ তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করে। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি নিজের সুবিধার কথা না ভেবে দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি।

যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় আমার নানুরা সোনাইমুড়ী থানায় রাজীবপুরে তাদের নিজ গ্রামে ছিলেন। কিন্তু পরে গ্রামে থাকা সম্ভব হয়নি। বাড়ির সকল সদস্য যে যার মত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিল। আমার নানুরা সবাই চলে গিয়েছিল হাটিরপাড় তাদের এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখানে তারা হিন্দু, মুসলমান সবাই একসাথে থেকেছেন। তখন আমার নানা বাড়িতে ছিলেন। তাদের বাড়ির পাশে একটি গর্ত করে রাখা হয়েছিল যাতে শত্রু বাহিনী এলে নানা ওই গর্তে লুকিয়ে পড়তে পারেন। নানা মাসে মাসে কিছু জিনিসপত্র আমার নানিদের জন্য দিয়ে আসতেন। আমার নানুর মুখে শুনেছি তারা সবকিছু ভাগাভাগি করে খেতেন। যুদ্ধের সময়টিতে আমার নানুদের ভাল ফসল হয়েছিল, ফলে খাবারের তেমন অসুবিধা হয়নি। এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার রাখা দরকার যে, আমার নানা ও নানু দুজনে ছিলেন চাচাতো জেঠাত ভাই-বোন। আমার নানুরা শত্রুদের ভয়ে অনেকদিন আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন। যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ তখন আমার নানুরা নিজ গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন।

এর কিছুদিন পর রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমার নানাদের গ্রামে আক্রমণ করে। ওরা বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন চালায়। আমার নানুদের পাশের বাড়িতে ঢুকলে মহিলারা তাদের ইজ্জত বাঁচাতে পানিতে লাফিয়ে পড়ে। আমার নানুর বাবা হাজী সিদ্দিক উল্লাহ ছিলেন মুক্তিবাহিনীর সহযোগী। মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করতেন। তাই আমার নানার বাড়ির প্রতি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছিল কুদৃষ্টি। দিনটি ছিল মঙ্গলবার, কিন্তু আমার নানুদের বাড়ির উপর দিয়ে বয়ে গেছে অমঙ্গলের ঝড়ো হাওয়া। ওরা সকাল ৮টা-৯টার দিকে এসেছে। যুদ্ধের শেষ দিকে পাকিস্তানিরা বিভিন্ন বাড়ি থেকে পুরুষদের ধরে নিয়ে হত্যা করেছিল বলে নানার বাড়ির সকল পুরুষরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিল। যখন পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করে তখন কোন পুরুষ না থাকায় তেমন ক্ষতি করেনি তবে নানান জিনিসপত্র নষ্ট

করেছে। নিয়ে গেছে অনেক খাদ্যপণ্য। আমার নানার ঘরে ওরা আসলে আমার নানার মা একজন রাজাকারকে চিনে ফেলে। ওই রাজাকারের অনুরোধে তারা আর ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করেনি। কারণ ওই রাজাকারের বাবার সাথে আমার মায়ের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আমার নানার মা ওদের সংসারের জন্য অনেক কিছু করে। সেদিন রাজাকার হিসেবে ওই ছেলেকে দেখে আমার নানার মা বলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত দেশের সাথে বেঈমানি করলি! আমি তোকে চিনে ফেলেছি। এই কথা শুনেই সেই রাজাকার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং পাকিস্তানি সেনাদের অনুরোধ করে ক্ষতি না করতে। যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জানা গেল ওই ব্যক্তি তার মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার জন্য রাজাকারে নাম লিখিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তাকে মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হয়।

সোনাইমুড়ী হাই স্কুলে ছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্প। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে মুক্তি বাহিনীর হাতে ক্যাম্প চলে আসে। সেদিন সেই বিজয়ানন্দে উল্লসিত মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে একজনের হাতের রাইফেল থেকে হঠাৎ একটি বুলেট বেরিয়ে গিয়ে তার বুকে লাগে। সেখানেই প্রাণ হারায় সেই বীর যোদ্ধা। আজও সে ঘটনা কালের সাক্ষী হয়ে আছে। আমার নানুর মুখে শুনেছি ১৯৭১ সালের ঘটনা বহুল সময়ের স্মৃতি। আজ আমার নানু বেঁচে নেই, তবু এই ভেবে ভালো লাগছে যে তিনি আমাকে শুনিয়ে গেছেন সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা।

সূত্র: জ- ৫৯০৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
হাছান মাহমুদ রায়হান	**আনোয়ারা বেগম**
সরকারী কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৬০, সম্পর্ক : নানু
৯ম শ্রেণি, বাণিজ্য শাখা, রোল : ১৬	

দুধের বাচ্চা হামাগুড়ি দিচ্ছে

আমার স্বামী ঢাকায় ছিলেন। যখন যুদ্ধ শুরু হল, তার কিছুকাল আগে আমাকেও ঢাকায় নিয়ে যান। যুদ্ধ শুরুর দুদিন পর তিনি আমাকে নিয়ে গ্রামের উদ্দেশে রওনা দেন। তখন যানবাহন পাওয়া খুব কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ফলে আমরা হেঁটে রওনা দিলাম। সাথে ছিল দুই ছেলেমেয়ে। ঢাকা থেকে হেঁটে আসতে আমাদের সময় লাগলো সাত দিন। আমরা যখন লঞ্চ দিয়ে নদী পার হচ্ছিলাম তখন নদীর মধ্যে কিছু পাকিস্তানি সৈন্য বোটের মাধ্যমে লঞ্চে উঠে। এরপর অনেক বাঙালিকে লাথি মেরে নদীতে ফেলে দেয়। অনেককে গুলি করে মেরে ফেলে। লঞ্চের চালককে তারা মারে না। এমতাবস্থায় আমার স্বামী উঠে গিয়ে তাঁদের সাথে উর্দুতে অনেকক্ষণ কথা বলে। পরে তারা আমাদের কিছু করে নাই। তারা লঞ্চ থেকে নেমে বোটে করে চলে যায়। লঞ্চ থেকে নেমে আমরা হাঁটা শুরু করি। আমরা পথে কখনও খাদ্য পেয়েছি আবার কখনো পাই নি। কিছুক্ষণ পর পর আমরা বিশ্রাম নিয়েছি গাছের ছায়ায় বসে। রাতে মানুষের বাড়িতে ঘুমিয়েছি।

চতুর্থ দিন দুপুরে একট ঘটনা ঘটে: আমরা আগের দিন কিছু খাইনি। ক্ষুধা তেষ্টায় অবশ হয়ে পড়েছি। সামান্য দূরে একটা সুন্দর গোছানো বাড়ি দেখতে পাই। বাড়িতে ঢুকে দেখতে পাই নলকূপ। সেখান থেকে প্রথমে পানি খাই। বাড়িতে কাউকে দেখতে পেলাম না। রান্না ঘরে দেখলাম খুব সুস্বাদু খাবার তৈরি করা রয়েছে পাতিলে। সেখান থেকে বের হয়ে ঘরে ঢুকে দেখি এক এক করে ঘরের সব সদস্যকে গুলি করে মেরে সমান্তরালে সাজিয়ে রেখেছে। তাদের উপরে একটি দুধের বাচ্চা হামাগুড়ি দিচ্ছে। তা দেখে আমরা সবাই ভয়ে চিৎকার দেই এবং দৌড়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই। এরপর অনেক কষ্টে আমরা বাড়িতে পৌঁছাই। বাড়িতেও আমাদের খেয়ে না খেয়ে কাটাতে হয়। আমরা বাড়ি গিয়ে দেখি অনেকের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমার স্বামী যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো। তার পিতা মানে আমার শ্বশুর তাকে কসম দেয় যাতে তিনি যুদ্ধে না যান। তার কসম রক্ষা করতে গিয়ে তিনি যুদ্ধে যান নি।

মে মাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা কয়েকজন আমাদের বাড়িতে আসে এবং গরু-ছাগল নিয়ে যায় এবং অনেক যুবতী মেয়েকে অপমানিত করে মেরে ফেলে। অনেকের গোলা থেকে ধান, চাল নিয়ে যায়। অনেকের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে আমরা এখান থেকে অনেক দূরে একটি স্থানে চলে যাই। সেখানেও অনেক কষ্ট করি। দেশ স্বাধীন হলে আমরা ফিরে আসি।

সূত্র: জ- ৫৯১২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আমান মাহ্‌দী মোহাম্মদ	**নূরজাহান বেগম**
সরকারী কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম ও ডাক : একলাশপুর
৯ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ১০	থানা : বেগমগঞ্জ, জেলা : নোয়াখালী
	বয়স : ৬৫ বছর

লাশ ডিঙ্গিয়ে টার্মিনালে আসলাম

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ ও ২৬ মার্চ স্বচক্ষে আমি ঢাকায় যা দেখেছি তার বিবরণ দিলাম। আমি গুলিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে নবাবপুর রেলওয়ে ক্রসিং-এর পূর্ব পাশে মাহবুব আলী রেলওয়ে ক্লাবে চাকরিরত ছিলাম। ২৫ মার্চ রাত দশটায় আমরা খবর পেলাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়েছে। ১১টার সময় তারা ঢাকা স্টেডিয়াম পার হয়ে গুলিস্তান রেল কলোনী, শাঁখারী বাজার নবাবপুর রোড ধরে সদরঘাটের দিকে চলে যায়। যাবার সময় আশেপাশের দোকান, বাড়ি-ঘর কলোনী সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে যায়। আমি ক্লাবের দোতলায় হাফওয়ালের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সব অবলোকন করছিলাম। অনেকক্ষণ পরে দেখলাম সারা শহর নীরব-নিস্তব্ধ। কার্ফ্যু জারি করা হয়েছে। ২৭ তারিখ সকালে দুই ঘন্টার জন্য কার্ফ্যু উঠানো হয়।

তখন আমার দশ বছরের ছেলে নবাবপুর হাই স্কুলে ক্লাস ফোর-এ পড়তো। তাকে নিয়ে দেশের উদ্দেশে সদর ঘাটের দিকে আসতে লাগলাম। রাস্তার দুইপাশে খালি লাশ আর লাশ। এই লাশ ডিঙ্গিয়ে সদরঘাট টার্মিনালে আসলাম। দেখি কোন লঞ্চ বা পারাপারের নৌকা নেই। পরে দুইখানা নৌকা দেখলাম দূরে। নদীর পাড়ে খালি লাশ। মাঝি অনেক কষ্টে লাশের মধ্য দিয়ে এসে আমাদের ৮-১০ জন লোক নিয়ে দক্ষিণপাড়ে জিনজিরা উঠিয়ে দিল। ওখান থেকে নদীর পার দিয়ে হেঁটে অনেক কষ্টে কাঠপট্টি এসে কিছু চিড়ামুড়ি, পানি খেয়ে লঞ্চে করে চাঁদপুর যাই। চাঁদপুর থেকে ফরিদগঞ্জ হয়ে পরে রামগঞ্জে আসি। ভোর পাঁচটায় রামগঞ্জ হতে লক্ষ্মীপুর পায়ে হেঁটে চৌরাস্তায় এসে নিজের বাড়ি আসি বেলা ৪ টায়।

সূত্র: জ- ৫৮৪৪

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
ফারহা সুলতানা তমা	**রুহুল আমিন**
সরকারী কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: আলীপুর
৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল: ১২	বয়স: ৭৫

ইঁদুর কেদার হে

ঘিওরের দিক থেকে পশ্চিমা বাহিনী নোয়াখালীর দিকে আসছে। এ খবর পূর্বেই ছড়িয়ে পড়ে। আমার পিতা বিকালে আমিন নিয়ে আসে বাড়ি মাপার জন্য। বাড়ির মাপযোক শুরু করার পরক্ষণে সবার চোখ উত্তর দিকে গেল। সবাই দেখলো সে দিকে আগুন। সবাই অনুমান করল পাঞ্জাবিরা আমাদের বেগমগঞ্জের দিকে আসছে। তখন আমার পিতা, দাদা-দাদি, বাড়ির প্রতিবেশি ও গ্রামবাসী সবাই গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি নিয়ে আবার কেউ বৃদ্ধ দাদা-দাদিকে কাঁধে নিয়ে গ্রাম-গঞ্জের দিকে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি আশ্রয় নেয়। ৫-৬ দিন পর কিছু

কিছু লোক তাদের নিজ নিজ বাড়ি ফিরে আসে। একসময় আমাদের গ্রামের ভিতরে হানাদার বাহিনী ঢুকে পড়ে। তারা হাঁস-মুরগি ধরে। কিছু মা-বোনদের উপর অত্যাচার করে। অনেককে মারধোর করে।

হানাদারদের সেই দল গিয়ে অন্যদল আসে। তারা আসার পর একটি বাড়িতে ঢোকে। ওই বাড়ির সবাই ছিল শিক্ষিত। একজন ডাক্তার। হানাদার বাহিনী আসার পরে ওই বাড়ির লোক তাদেরকে খুব সম্মান দেখায়। ডাব ও ডিম মামলেট করে হানাদার বাহিনীর সামনে নেয়া হয়। তারা ডাবগুলো খেল, ডিম খেলো না। বাড়িতে দু'জন বৃদ্ধ ছিল এবং তাদের দুই জন যুবতী নাতনি ছিল। ওদেরকে বলল, আমরা যতদিন আপনাদের বেগমগঞ্জ টেকনিক্যালে থাকব ততদিন আপনারা কোন চিন্তা করবেন না। আমরা চলে যাবার পরে খারাপ লোক আসতে পারে। আপনারা আমাদের মা-বাবার মতন। ওরা আমাদের বোনের মতন। যদি কোন খারাপ লোক আসে তখন ঘরের ভিতরে আমার বোনদেরকে কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য বলবেন। আর আপনারা দুইজন দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমাদের লোক যতকিছুই করুক কোরআন শরীফ যেন বুকের মধ্যে রাখে। তার পরে তারা চলে যায়।

পরবর্তী আরেকটি দল আসে তাদের বাড়ির পাশে। ওই বাড়ির নতুন একটা ঘরের মধ্যে চার-পাঁচ বাড়ির মহিলা এক সাথে থাকত। তারা এসব মহিলাদেরকে অনেক মারধোর করে। এক জনের ইজ্জতের উপর হামলাও করে। তারপর আমাদের গ্রামে আর ঢুকতে পারেনি।

আমাদের গ্রামে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে আইডেনটিটি কার্ড ছিল। কোন দল এলে তিনি ওই কার্ডটা তাদের কমান্ডারকে দেখিয়ে বলতো, এ গ্রাম আমার। এ গ্রামের উপরে যেন কোন হামলা না আসে। তারপর সেদিন থেকে আমাদের গ্রাম নাজিরপুর, আমানতপুরের ভিতরে তারা আর আসেনি। রহিমপুরের রোডে তারা চলাফেরা করত।

আমাদের এলাকায় কিছু লোক রাজাকারে ভর্তি হয়। রাজাকাররা অর্থশালী মানুষের উপর হামলা করত। টাকা-পয়সা, স্বর্ণালংকার নিয়ে যেত ও হানাদার বাহিনীকে অনেক কিছু সংবাদ দিত। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে অত্যাচার করত। রাস্তার উপর কারও ছাগল থাকলে হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যেত। আর মুসলমান দেখলে তারা বলতো, হাম মুসলমান তোম মুসলমান ইঁদুর কেদার হে? অর্থাৎ আমি মুসলমান তুমিও মুসলমান, হিন্দু কোথায়? এ বলে অনেক মুসলমানের কাপড় খুলে ফেলতো। আর সন্দেহ হলে তাদেরকে বেগমগঞ্জ কালা পোলের গোড়ায় নিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলতো। পরে লাশগুলো ফেলতো খালের ভিতরে। সুন্দরী মা-বোন দেখলে তারা নিয়ে আসতো টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে। ইজ্জতের উপর হামলা করে মেরে ফেলতো। কিছু মা-বোন ধরেও রাখতো। ইজ্জতের উপর হামলা করার পর যারা বেঁচে থাকত তাদের কিছু ছেড়েও দিত।

এইভাবে কয়েক মাস যাওয়ার পরে একদিন আমাদের নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর রোডে কয়েকশ রাজাকার চলে আসে বেগমগঞ্জ চৌরাস্তায়। তারা টেকনিক্যালে হানাদার বাহিনীর সাথে থাকে আর চর্তুদিকে অত্যাচার করে। তারও কয়েক মাস পরে হানাদার বাহিনী গাড়ির উপরে গাছের ডাল-পাতা দিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে যায়। তখন রাজাকার বাহিনী তাদের জান বাঁচানোর জন্য লুকাতে থাকে।

আমরা শুনতে পেতাম যে, হেলিকপ্টার থেকে হানাদার বাহিনী প্যারাসুট করে নামবে। তখন লোকে ঘরের ভিতরে গর্ত তৈরি করতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কিছু আগে মুক্তিবাহিনী লক্ষ্মীপুর থেকে আমাদের বেগমগঞ্জ থানায় আসে। ওই সময় ছিল শুধু রাজাকার, হানাদার বাহিনী ছিল না। তখন কালাপোলের উপর থেকে একটা রকেট বোম মারা হয় টেকনিক্যালের ওপরে। টেকনিক্যালের একটি কোণা এতে ভেঙে পড়ে। পরে মুক্তিযোদ্ধারা চতুর্দিক থেকে এসে প্রথমে বেগমগঞ্জ থানা দখল করে। আস্তে আস্তে টেকনিক্যালের দিকে রওনা দিয়ে সেটা দখল করে। সেখানে কিছু রাজাকার পাওয়া যায়। তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধারা মেরে ফেলে। আমাদের পাশের বাড়িতে অনেক মুক্তিযোদ্ধা এসে জমায়েত হয়। আমরা গ্রামবাসী তাদেরকে অনেক সহযোগিতা করি। গ্রামবাসী ও মুক্তিযোদ্ধারা চার-পাঁচজন রাজাকার ধরে আনে। একটা রাজাকার ছিল আমাদের গ্রামের। সে খোলা পায়খানার তলে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে লুকিয়ে ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেনেড দিয়ে তাকে মেরে ফেলে।

মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী সম্মিলিতভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যৌথবাহিনীর হাতে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তাই ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস।

সূত্র: জ- ৫৮৫৬

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
বিবি হাজেরা (মুন্নী)	**আব্দুল মতিন**
সরকারী কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : মধ্যম নাজিরপুর, ডাক : নাজিরপুর
৭ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ০১	থানা : বেগমগঞ্জ, জেলা : নোয়াখালী
	বয়স : ৫০ বছর, সম্পর্ক : বাবা

চারটা পর্যন্ত আগুন জ্বলেছে

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অনেক হিন্দু ভারত চলে যায়। ভারত সরকার যে এতো সহযোগিতা করবে তা ছিল কল্পনার অতীত। হিন্দু মুসলমান সবাইকে সমানে ডাল-চাল, চিড়া-মুড়ি, দুধ-চিনি, কাপড়, নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সব কিছু দিতে আরম্ভ করল। তা দেখে বাংলাদেশের মানুষ ফেলে আসা বাড়িঘরের কথা ভুলে গেল। আমরা বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে পারলাম না। কত দুঃখের ভেতর যে দিনযাপন করেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা বড় কঠিন। চৈত্র মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হলো, ভাদ্র মাসের ৫ তারিখে আমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। সেনবাগ থানার পূর্ব-দক্ষিণে আমাদের বাড়ি, পূর্ব পুরুষের আমলে আমরা ছিলাম জমিদার। আমাদের সময়ে কিছু জমি ছিল। জমির ধান, গাছের নারিকেল-সুপারি, পুকুরের মাছ– মোটামুটি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন ভালো কেটেছে। বাড়ি পোড়ার পর অভাব-অভিযোগ এসে ভর করলো আমাদের ওপর। ভাবতে অবাক লাগে, ছেলে-মেয়ে নিয়ে কীভাবে বেঁচে ছিলাম। দয়াময়ের অশেষ করুণা ছিল; তাই আমরা এই পর্যন্ত বেঁচে আছি।

সব সময় রাজাকার এসেছে গ্রামে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢুকেনি। ওরা গ্রামে থাকত না, ওরা কাজ করেছে টাউনে। যখন বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল তখন বেলা নয়টা বাজে। প্রায় চারটা পর্যন্ত আগুন জ্বলেছে। কেউ এসে আগুন নেভানোর কাজে সহযোগিতা করেনি। বিকলে একজন মুসলমান ছেলেকে ডেকে গাছ থেকে পেড়ে সবাই ডাবের জল খেয়ে রাত কাটিয়েছি। রাত্রে ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। কোথায় যাব বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে? এক খানা ঢেঁকিঘর বাকি ছিল পুড়তে। কোনো রকমে গাদাগাদি করে বসে থেকে রাত কাটিয়েছি। পরদিন কী হবে হাঁড়ি পাতিল কোথায় পাব; ডাল চাল কী ব্যবস্থা হবে এই চিন্তায় অস্থির ছিলাম সবাই। বাড়ির কাছে এক আত্মীয় ছিল; ওরা ভাত তরকারি নিয়ে এলো। তা শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী, ছেলে-মেয়ে সবাইকে খাওয়াই। এই পরিস্থিতিতে আমাদের দিন কেটেছে।

এই বয়সে আর কত লিখব? বোধ হয় সাত দিন সাত রাত্র লিখলেও যুদ্ধের কাহিনী শেষ হবে না। গ্রামের হিন্দু বাড়িগুলো নষ্ট করেছে বেশি। রাজাকার বাহিনী টাকা আদায়ের জন্য আমার জেঠা শ্বশুরকে রাইফেল দিয়ে মাথায় আঘাত করেছে, আর কাউকে মারধর করেনি।

আমাদের পরিবারের সবাই ছিল চাকরিজীবী। দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে সবাই চাকরিতে যোগদান করে। আবার পূর্বের মতো বাড়িঘর ভগবান জোগাড় করে দিল। সবাই ভালোভাবে আছি।

সূত্র: জ-৫৮৮৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সঞ্জয় সাহা	**জয়শ্রী সাথী**
সরকারি কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়	

শ্রেণী: ৮ম (খ), রোল নং: ৫৮

পনের মিনিট পরে গুলির শব্দ শোনা যায়

আমি আমার দাদুকে ৭১-এর কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি কেঁদে ফেলেন। বলেন, কি হবে সে রাতের কথা শুনে? কেউ কি ফিরিয়ে দিতে পারবে তার জীবনের সে দিনগুলো? তারপর কান্না ভেজা কণ্ঠে তিনি যা বললেন তা আমি নিচে লিখছি–

সেদিন কত তারিখ মনে নেই। রাত আনুমানিক ১২টা। সবাই ভয়ার্ত, কারণ গ্রামে মিলিটারি এসেছে। ঘুমিয়ে পড়ছেন লতিফ মিয়া, তার স্ত্রী ফাতেমা বেগম ও তাদের তিন মাসের ছেলে সন্তান। হঠাৎ বাইর থেকে কে যেন ডাকে। লতিফ মিয়া ঘুম হতে উঠে চোখ মুছতে মুছতে দরজা খোলেন, ফাতেমা বেগম তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে থাকেন। লতিফ বাইরে যান এবং ফিরে এসে স্ত্রীকে বলেন, দরজা বন্ধ করে রাখো, আমি যাবো আর আসবো। ফাতেমার মনে ভয় হয়। সে স্বামীকে না যাওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করে। তিনি তার স্ত্রীর কথা না শুনে চলে যান। যাওয়ার মিনিট ১৫ পর গুলির শব্দ শোনা যায়। ফাতেমার হাত পা সব শীতল হয়ে আসে। নিজে মহিলা তার ওপর ভয় এজন্য ঘর থেকে বের হননি। সকালের অপেক্ষায় বসে থাকেন। সকাল হলে শুনতে পান মিলিটারিরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেকগুলো লোক খুন করেছে। ফাতেমা ছুটে যান। স্কুলে দেখতে পান পরিচিত-অপরিচিত লাশের সাথে তার স্বামীর লাশ। যা দেখে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফেরার পর জানতে পারেন যে, রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধা সেজে তার স্বামীকে ডেকে নিয়ে যায়।

আমরা নবীনরা জানি না যে যুদ্ধে কত ফাতেমা স্বামী হারিয়েছে। কত মা তাদের সন্তান হারিয়েছে। যারা আমাদের জন্য এ স্বাধীনতা এনেছে, তাঁরা আজ বেঁচে নেই এ কথা বললে ভুল হবে। তাঁরা আজীবন আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে মুক্তির প্রতীক হয়ে।

সূত্র: জ-১৮৩৩

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মারজাহান আক্তার স্বর্ণা	**ফাতেমা বেগম**
জয়াগ মহাবিদ্যালয়	গ্রাম : মাহুতলা, নোয়াখালী
একাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ	বয়স : ৫৫ বছর

ভাই দরজাটা বন্ধ করুন

যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমি যুবক। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের জনগণের উপর অনেক অত্যাচার করে। শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাংলার মানুষ সরাসরি অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধ চলাকালীন একটি ঘটনা আমার এখন মনে পড়ছে।

আমাদের পার্শ্ববর্তী নান্দিয়াপাড়া বাজারে মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে। ওই সময়ে এক রাত আমি একটি টেটা হাতে মাছ শিকার করছিলাম। অনেকক্ষণ যাবত মাছ শিকার করার পর আমি পাঁচটা কৈ মাছ পাই। যার প্রত্যেকটা প্রায় ৬ ইঞ্চির মতো লম্বা ছিল। পরে আমি বাড়িতে যাই। ঘরের দরজা খুলে আমি আমার বিছানায় তিনজন ব্যক্তিকে দেখতে পাই। তারা ছিল মুক্তিযোদ্ধা। তা আমি বুঝতে পারি। তারা আমাকে বলল, ভাই দরজাটা বন্ধ করুন। কারণ গ্রামের মানুষ আমাদের আগমনের কথা জানতে পারলে তোমার ক্ষতি হতে পারে। আমি তাদেরকে বলি, আপনারা চিন্তা করবেন না। আমাদের গ্রামে কোনো রাজাকার নাই। পরে বলল, তারা কোন খাবার খাবে না কিন্তু আমি যেন তাদেরকে সকাল হওয়ার পূর্বে ঘুম থেকে উঠিয়ে দেই। আমি বলি, আপনারা কোনো চিন্তা

করবেন না। আপনারা একটু বিশ্রাম নিন। তারপর আমি তাদের জন্য তিনটি কৈ মাছ ভাজি করি এবং ভাত খেতে দেই। তারা ভাত খেতে রাজি হচ্ছিল না। অনেক অনুরোধের পর তাদেরকে ভাত খাওয়ালাম। খাবার পর তারা ঘুমাল এবং আবার বললো, তাদেরকে যেন সকাল হওয়ার পূর্বে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিই।

কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠতে তাদের দেরি হয়ে যায়। কারণ তারা অনেক রাতে ঘুমিয়েছিল। তারপর তারা আমাকে বললো, আপনি আমাদের ও আপনার অনেক ক্ষতি করলেন। যদি এখন গ্রামের মানুষ আমাদের কথা জানতে পারে তাহলে তোমার অনেক ক্ষতি হবে। আমি বললাম, আপনাদের কোনো চিন্তার প্রয়োজন নাই। তারপর তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি জয়াগ বাজার যাবেন? আমি বললাম না। তবে আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে পারি। পরে আমি তাদের বলি, আপনারা একজন একজন করে আমার পিছনে আসুন। আমি আমার বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে যাই এবং তাদের বলি উত্তর দিকে জয়াগ বাজার। তারা বাজারের দিকে রওনা হলো এবং আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছি যেন কেউ তাদের আক্রমণ না করে। পরে আমি দেখতে পাই কিছু লোক আসছে আমার দিকে। তারা আমাকে জিজ্ঞাস করলো, ওই যে যাচ্ছে লোকগুলো কারা? তারা কোথায় যাচ্ছে? আমি বলি, কে জানে। তারা কারা এবং কোথায় যাচ্ছে তা জিজ্ঞাস করে কী মরবো? তারা তাদের পথে যাক, আপনারা আপনাদের পথে যান।

পরে মুক্তিবাহিনীর লোকগুলো জয়াগ বাজারের উত্তর দিকে যায়। আমি আমার বাড়িতে যাই। এই ঘটনাটি এখনো আমার চোখে ভাসছে।

সূত্র: জ-২১১৯

সংগ্রহকারী :
নূর হোসেন
জয়াগ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
শ্রেণী-দশম, মানবিক, রোল : ১

বর্ণনাকারী :
মো. ওলি উল্যাহ
গ্রাম : জুগিখিল পাড়া, ডাক : জয়াগ বাজার
থানা : সোনাইমুড়ী, জেলা : নোয়াখালী
বয়স : ৭৫, সম্পর্ক : বড় জেঠা

স্বাধীন বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল

পাক হানাদার বাহিনী বাঙালিদের মধ্যে গরিব নিরীহ লোক ও মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে বিভিন্ন রকম লোভ দেখিয়ে রাজাকার ও আলবদর বাহিনীতে ঢোকাতে থাকে। তাদেরকে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ ও গোলাবারুদ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি ও পথঘাট চেনার পথ সুগম করে নেয়। এই সময় আমাদের পরীক্ষা আসলো। আমার ক্লাসের অনেক ছাত্র পরীক্ষা দিতে চলে গেলো, কিন্তু আমার মনে আসলো দেশকে স্বাধীন করার কথা। আমি ভাবলাম দেশকে রক্ষা করতে পারলে আমার পড়া লেখা একদিন হবে। এই মুহূর্তে দেশকে রক্ষা করাটা ফরজ। আর তখন আমি স্থির করলাম ভারতে মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের জনসাধারণের খেদমত করব। তখন আমার মামাতো ভাইসহ একদল যুবক ভারতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আমিও তাদের সাথে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু আমি তাদের থেকে বয়সে ছোট। তারা আমাকে না নেয়ার কথা বলল। আমার দুই বৎসর বয়সে বাবা মারা যায়। আর আমরা ছিলাম দুই ভাই। আমার মা আমাকে খুবই আদর করত। যখন আমার মা শুনলো আমি ভারতে যাব। তখন কান্না শুরু করল।

তখন মা আমাকে বললো, তোমরা দুই ভাই। তোমার বড় ভাই এনায়েত উল্লাহ হচ্ছে রোগা। তাই তোমার উপর আমার জীবনের একমাত্র ভরসা। যদি তুমি রাস্তায় গিয়ে মারা যাও তাহলে আমার কী উপায় হবে? তুমি দেশে থেকে মুক্তিবাহিনীর খেদমত কর। ওই সময় আমাদের এলাকায় বিআরআরআই চাষ হয়। আর এই ধান চাষ নিয়ে আমাদের বাড়িতে প্রতিপক্ষের সাথে আমার চাচাতো ভাইয়ের মারামারি হয়। যার জন্য আমরা থানায় জিডি

করার সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু ওই দিন সকল যানবাহন বন্ধ ছিল। থানা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে ১৪ কি.মি. দূরে। তাই আমি পায়ে হেঁটে থানায় রওনা হলাম। থানার একটু আগে রাস্তায় একটি মিছিল দেখতে পাই। যেখানে অনেক মানুষ স্লোগান তুললো-

'মরিছেরে মরিছে/টিক্কা খান মরিছে।' আমিও মিছিলে যোগ দিই এবং এই স্লোগানটি দিতে থাকি। পরে আমার কাজ সমাপ্ত করে পুনরায় হেঁটে বাড়ি পৌঁছলাম।

এরই মধ্যে ধুমধাম যুদ্ধ লাগল। রাত দিন গোলা বারুদের আওয়াজে মানুষ আতঙ্কিত থাকতো। আমরা নোয়াখালীর পশ্চিমে ১ নং জয়াগ ইউনিয়নের অধিবাসী। আমাদের পার্শ্ববর্তী দুইটি ইউনিয়ন হচ্ছে নান্দিয়াপাড়া ও নদনা। যা বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছিল। এরই মধ্যে নোয়াখালীতে পাক হানাদার বাহিনী প্রবেশ করে। তখন আমরা এই তিন ইউনিয়নের জনগণ মিলিত হই এবং সোনাইমুড়ী টু রামগঞ্জ পি ডবিউ রাস্তা, নদনা পুলের পূর্ব পার্শ্বের রাস্তা এবং নান্দিয়াপাড়া সিমানা হলের সোনাইমুড়ী এবং কড়িরহাটি রাস্তা কেটে খালে পরিণত করি। যাতে করে পাকহানাদার বাহিনী সোনাইমুড়ী থেকে পশ্চিম দিকে প্রবেশ করতে না পারে। আমিও রাস্তা কাটার সাথে জড়িত ছিলাম। রাস্তা কাটার পর আমাদের এই তিন ইউনিয়নকে পূর্ণ স্বাধীন বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। এই দুই রাস্তা দিয়ে পাকহানাদার বাহিনী প্রবেশ করার বহু চেষ্টা করে। পশ্চিমপাড়ে মুক্তিবাহিনী ঘাঁটি করে এবং বহু মরিচা খনন করে। ওই মরিচা খননেও আমি কাজ করি।

একদিন সেই সোনাইমুড়ী টু রামগঞ্জ রাস্তা দিয়ে খুব জোরালোভাবে পশ্চিম দিকে প্রবেশ করার জন্য হানাদার বাহিনী বিপুল সংখ্যক ট্যাংক, কামান, হেভি অস্ত্র সহকারে আক্রমণ চালায়। আর তখন মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে দাঁতভাঙা জবাব দেন। ওই স্থানে হানাদার বাহিনীর কিছু লোক মারা যায়। পরক্ষণে তারা বেগমগঞ্জ তথা নোয়াখালী ত্যাগ করে। এই সময়ে আমাদের এলাকায় মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুবেদার শামসুল হক এবং সুবেদার লুৎফর রহমান। তার কিছু দিন পর রাজাকার বাহিনীর সহযোগিতায় পাকহানাদার বাহিনী সোনাইমুড়ী টু রামগঞ্জ রাস্তা দিয়ে জয়াগ বাজারে প্রবেশ করে। তারা জয়াগ বাজারের অনেক মানুষকে হত্যা করে। পরে তারা জয়াগ গান্ধী আশ্রমে যায় এবং সেখানে দুইজন হিন্দুকে হত্যা করে। জয়াগ হতে তারা উত্তর দিকে মোহাম্মদপুরে যায়। যাওয়ার সময় তিনজন মাছ শিকারীকে হত্যা করে। পুনরায় তারা জয়াগ বাজারে আসে দরিদ্র মানুষের ছাগল জবাই করে রান্না করে খায়। জয়াগ বাজারে দুইদিন অবস্থান করার পর সোনাইমুড়ীতে ফিরে যায় এবং অনেক চেষ্টা করে নান্দিয়াপাড়া যাওয়ার জন্য। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর কারণে যেতে পারে না। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের এই এলাকায় আর প্রবেশ করতে পারেনি। আমরা তাই এলাকাকে মুক্ত ও স্বাধীন ঘোষণা দিয়েছিলাম, যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত তা বহাল থাকে।

সূত্র: জ-২১২১

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মোঃ নূর হোসেন	**মোঃ হাবিবুর রহমান**
জয়াগ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : গুগিখিল পাড়া, ডাকঘর : জয়াগ বাজার
শ্রেণী : দশম, মানবিক, রোল : ১	থানা : সোনাইমুড়ী, জেলা : নোয়াখালী
	বয়স : ৫৫, সম্পর্ক : চাচা

সেই বৃদ্ধাকে এখনও স্মরণ করি

আমাদের গ্রামে একজন বৃদ্ধ ছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারদের হাতে তার ছেলে প্রাণ হারায়। ওই মহিলা রাজাকারদের ভাত তরকারি রান্না করতো। একদিন রাজাকাররা আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্চিল। তখন আমি এবং আমার বন্ধুরা সবাই মিলে গুলি চালাই। রাজাকাররাও গুলি চালায়। আমার বন্ধু জহির রাজাকারদের

গুলিতে প্রাণ হারায়। এক পর্যায়ে আমাদের গুলি শেষ হয় যায়। তখন গ্রামের একজন লোক আমাদের ধরিয়ে দেয়। আমাকে এবং আমার বন্ধুদের টেনে হিঁচড়ে রাজাকাররা তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আমাদের এক সারিতে সাজিয়ে রেখে প্রথমে আমার বন্ধু হাসিমকে হত্যা করে। তখন ওই বৃদ্ধ মহিলা আমাকে দেখে আমার জন্য মায়া হলে রাজাকারের পায়ে পড়ে বলে, এ আমার সন্তান, তাকে মেরো না ছেড়ে দাও। তার আকুল আকুতিতে রাজাকাররা আমাকে ছেড়ে দেয়।

কয়েকদিন পরে আমাদের গ্রামের ওই লোকটা যে খবর দিয়ে আমাকে এবং আমার বন্ধুদের ধরিয়ে দিয়েছিল সে অন্যদেরসহ ওই বৃদ্ধা মহিলাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। কারণ বৃদ্ধা আমাকে মুক্তির জন্য রাজাকারদের কাছে অনুরোধ করেছিল।

সেই বৃদ্ধাকে আমি এখনো স্মরণ করি।

সূত্র: জ-১৮৬০

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
নাজনীন সুলতানা জুঁই	**ইব্রাহিম খলিল উলাহ্ পাটওয়ারী**
কালিতারা মুসলিম গার্লস একাডেমী	গ্রাম : সল্ল্যাগটিয়া, নোয়াখালী
শ্রেণি: ১০, রোল : ১৩, বয়স : ১৫	বয়স : ৭৩, সম্পর্ক : নানা

ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না

১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আমি বিয়ে করি। বিয়ে করার পর আমি চলে যাই ঢাকায়। কারণ ঢাকায় আমার দোকান ছিল। ১৯৭১ সালে আমি নিজ চোখে দেখি পাকহানাদাররা মিছিলকারীদের উপর অন্যায়ভাবে গুলি চালায়। আর রাতের অন্ধকারে মা-বোনদের ওপর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালায়। চারদিকে কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। তার কয়েক দিন পরে এই সমস্ত মর্মান্তিক ঘটনা দেখে আমি নোয়াখালীতে চলে আসি।

এখানে এসেও দেখি মানুষের কী দুঃখ দুর্দশা! আমি বাজার করতে সোনাপুর গিয়েছিলাম। যাওয়ার সময় শুনি সবাই বলাবলি করছে যে, কী হলো দুনিয়ার হাল! তখন কেউ কেউ বলছে, ওদিকে যেওনা ভাই বিবাদ হবে কিন্তু আমি সাহস করে গিয়েছিলাম। বাজারটা সেই সময় ছিল ইস্টিশনের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণায়। বাজারে গিয়ে দেখি, সোনাপুর আগুন জ্বলছে। এসব ঘটনা ঘটায় মিলিটারিরা। এদের সঙ্গে যোগ দেয় রাজাকার মোস্তফা, মনা মিয়ার ভাই ভুলো। তারপর এরা সবাই মিলে সোনাপুর ইস্টিশনের মাস্টারকে হত্যা করে।

মিলিটারিরা যখন বাজারে আসে তখন আমি এক জেলের কাছ থেকে মাছ কিনছি। কিন্তু মাছ কিনবো কি, জেলে তো ভয়ে সব মাছ ফেলে রেখে দৌড়ে চলে যায়। বর্তমানে যেখানে ইস্টিশন সেখানে এক মাঝিকে গুলি করে। সোনাপুরে যেখানে ধানের মেশিন, সেখানে একজন লোককে ধরে এনে মেরে ফেলে। দুদু মিয়ার ভাইকে মারে দিনের বেলায়। আমি এসব ঘটনা দেখে রাত প্রায় ১০টায় বাড়িতে আসি। এসে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসলাম। বসা মাত্রই আমাদের পাশের বাড়িতে আওয়াজ শোনা যায়। রাতের বেলা আর কি করবো। পরের দিন সকালে ওই বাড়িতে গিয়ে দেখি রাতের বেলা মিলিটারিরা নিষ্ঠুরভাবে সবাইকে মেরে ফেলেছে। এসব ঘটনা দেখে আমি আবার বাজারে যাই। যাওয়ার সময় সবাই বলছে, ওদিকে যাবেন না। কিন্তু আমি সাহস করে গেলাম। গিয়ে দেখি বেড়িবাঁধের নিচে মিলিটারিরা রাইফেল নিয়ে বসে আছে। তারা বাজারে অনেককে হত্যা করে সব লুটপাট করেছে। ওইদিন রাতের বেলায় কাল্লু মিয়ার বাড়িতে মিলিটারিরা ঢুকে এক বৃদ্ধকে বুট জুতার আঘাতে মেরে ফেলে। তার স্ত্রী ও সন্তান শত চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারেনি। আসুদিয়ার স্কুলের বারান্দায় একজন লোক কোরআন শরিফ পড়ছিল। তাকে গুলি করে মেরে ফেলল। আমার সামনে তোর চাচা আলম ও সেকান্দরকে ধরে

নিয়ে যায়। আমি আম্মুকে তোর নানুর বাড়িতে দিতে গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানেও একই অত্যাচার চলছে। ১৯৭১ সালের ঘটনা এমনই যা ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না।

সূত্র: জ-১৮৬৩

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
তালিমা বেগম	**সামছুল কবির চৌধুরী**
কালিতারা মুসলিম গার্লস একাডেমী	গ্রাম : জালিয়াল, ডাক : পাক কিশোরগঞ্জ
দশম শ্রেণি, রোল : ৩০	বয়স : ৮০

পশ্চিম পাশের বড় বাড়িটা পোড়াবে

ঘটনাটি আমার নানুমনির কাছ থেকে শুনেছি। ১৯৭১ সাল। আমার নানুভাইয়া পুলিশের ওসি এবং মুক্তিযোদ্ধা। তিনি চট্টগ্রামে রাউজান থানার ছিলেন। তখন চারদিকে শুধু কামান, বারুদ আর গুলির বিকট আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। এ সময় গ্রামের বাড়ি আসাটা আমার নানুভাইয়ার খুব জরুরি হয়ে গেল। তাই তিনি ছদ্মবেশে লুকিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে এলেন। কারণ হানাদার বাহিনী সেই সময় পুলিশ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার জন্য খুঁজছিল। নানুভাইয়া বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে যেন খবরটা হানাদার বাহিনীর কানে চলে যায়। রাত দুইটার সময় হানাদারবাহিনী গাড়ি নিয়ে আমার নানুবাড়ির দিকে আসতে থাকে। কিন্তু রাস্তা সরু বলে গাড়ি আর ভেতরে ঢুকতে পারল না। হানাদারবাহিনীর কয়েকজন নানুবাড়ি পুড়িয়ে ফেলার জন্য বাড়ির গেট পর্যন্ত এলো। তাদের উপর হুকুম ছিল যে, তারা পশ্চিম পাশের বড় বাড়িটা পুড়িয়ে ফেলবে। কিন্তু তারা ভুল করে পূর্ব পাশের বড় বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। তখন আমার নানু ভাইয়া ধানক্ষেতে রিভলভার হাতে লুকিয়ে ছিলেন। যে বাড়িটা পুড়ে গিয়েছিল তারা কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে যায়। কিন্তু তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

সূত্র: জ-১৮৬৭

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
শাহিদুল নাহার	**হোসনে আরা বেগম**
কালিতারা মুসলিম গার্লস একাডেমী	গ্রাম : সল্যাঘটাইয়া
শ্রেণি : ১০ম, বয়স : ১৫, রোল : ১৭	বয়স : ৬০

ওদের শর্তে রাজি হলাম

আমরা তখন চর লক্ষ্মীগ্রামে বাস করতাম। ১৯৭০ সালের ভয়াবহ বন্যায় নিকট আত্মীয়দের অনেককে হারিয়েছি। আমি ব্যবসা করতাম রামগতি বাজারে। বড় কাপড়ের দোকান ছিল আমার। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দল। সরকারও নানাভাবে সাহায্য দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়কার বর্বরতা পাকিস্তান সুনাম মুহূর্তেই শেষ করে দিল।

হঠাৎ একদিন পাঞ্জাবিরা আক্রমণ করল রামগতি বাজার। দুই ঘণ্টার অভিযানে ওরা নিরস্ত্র অসহায় হিন্দু ব্যবসায়ীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করল। লুটপাট করল সকল দোকান। অনেক মুসলিম ব্যসায়ীকেও নৃশংস নির্যাতন করল। যারা পালিয়েছে তাদের দোকান লুট করেছে। আমরা কয়েকজন অনেক নির্যাতন সহ্য করে প্রাণে বাঁচি। রাতে বাড়ি গিয়ে দেখি ওরা ঘাঁটি করেছে আমাদের বাড়িতে। বন্দি করেছে আমার ছোট দুই ভাইকে। বলেছে, ওদের রুটি এবং খাদ্য তৈরি করে দিলে আমার ভাইদেরকে আর কোনো নির্যাতন করবে না এবং ছেড়ে দেবে। ভাইদের জীবন এবং মা বোনদের ইজ্জত বাঁচাতে ওদের শর্তে রাজি হলাম।

পরদিন ওরা দেশীয় সহযোগীদের সহায়তায় এলাকার হিন্দুদের উপর নারকীয় অত্যাচার চালায়। তাদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়নি মুসলিম ঘরের কুমারী মেয়েরাও। এসব দেখে নীরবে নিভৃতে কাঁদতাম। আর প্রতিদিন

এলাকার অসহায় নারীদেরকে বাড়িতে এনে আশ্রয় দিতাম এবং রাতে নৌকাযোগে নোয়াখালীর পথ ধরিয়ে দিতাম।

এইভাবে একদিকে রুটি এবং খাদ্য দ্রব্য দিয়ে পাঞ্জাবিদের সহায়তা করতাম অন্য দিকে রাতদিন মা-বোনদেরকে বাঁচাতে চেষ্টা করতাম।

সূত্র: জ-১৮৯৯

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
আসমা আক্তার	**আবদুল শহিদ**
কালিতারা মুসলিম গার্লস একাডেমী	গ্রাম : চর আফজল
নবম শ্রেণি, রোল : ২৮	বয়স : ৮০ বছর

মুক্তিযোদ্ধাদের অন্য পথে যেতে সাহায্য করে কৃষকেরা

মুক্তিযুদ্ধের এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন দাদা মোঃ সোলায়মান। তার বয়স ৬৩ বছর।

দাদা আমাকে বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সোনাপুর টুকু বকশি মসজিদের পাশে আশ্রয় নেন। এ সময় মিলিটারিরা তাদের অবস্থানের কথা জানতে পারে এবং আক্রমণ করার জন্য পরিকল্পনা করে। এ খবর জানতে পেরে মুক্তিযোদ্ধারা সোনাপুর থেকে দক্ষিণ দিকে চর জব্বরের রাস্তা ধরে সামনের দিকে পালানোর চেষ্টা করেন। মিলিটারিরা তাদের পিছু নেয়। নিরুপায় হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তার পাশের ধান রোপার কৃষকদের সাহায্য নেন। ওই কৃষকদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার দাদা সোলায়মান। তিনি অস্ত্রগুলো জমির আইলে খড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কৃষকদের সাথে জমি রোপনের কাজে লাগিয়ে দেন। মিলিটারিরা সেখানে এসে হাজির হয়। এবং কৃষকদের জিজ্ঞাসা করে এদিকে কয়েক জন মুক্তিযোদ্ধা এসেছে কিনা। কৃষকেরা বলে তারা এসেছিল তবে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। এ কথা শুনে মিলিটারিরা তাদের পথ অনুসরণ করে। মিলিটারিরা চলে যাওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তাদের অস্ত্র নিয়ে অন্য পথে চলে যেতে সাহায্য করে কৃষকেরা। ওই মুক্তিযোদ্ধাদের এক জনের নাম আবু সুফিয়ান। তিনি আজও বেঁচে আছেন এবং তারা সেদিনকার মত ওই কৃষকদের উপস্থিত বুদ্ধির কারণে মিলিটারির হাত থেকে বেঁচে যান। আমার দাদা বলেন, এটাই তার দেখা মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা।

সূত্র: জ-১৯০৬

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
জান্নাতুল ফেরদৌস	**মোঃ সোলায়মান**
কালিতারা মসলিম গার্লস একাডেমী	বয়স : ৬৩, সম্পর্ক : দাদা
১০ম শ্রেণি : রোল : ৯, বিভাগ : মানবিক	

নামাজ পড়া অবস্থায় রাজাকার ইশারা দিল

আমি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমার নানুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বলেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের বাড়ির পাশে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। তিনি মেয়ের বিয়ের জন্য কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন শহরে। আজান শুনে তিনি একটি মসজিদে ঢুকলেন নামাজ পড়ার জন্য। এক রাজাকার তার পাশে নামাজ পড়ছিল। সে একজন পাকসৈন্যকে ইশারা দিল। সৈন্যটি তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করে তার সব লোকদের ডাক দিলে সবাই চলে আসে। তখন ওই ব্যক্তিটি নামাজ শেষ করে মোনাজাত ধরেছে। এমন সময় ওরা লোকটিতে ধরে নিয়ে যায় তাদের ক্যাম্পে। সেখানে লোকটিকে ভীষণভাবে অত্যাচার করে। পরে কয়েকটি গুলি

চালায় লোকটির বুকে। সাথে সাথে তিনি মারা যান। তারা লাশটি এনে ফেলে দিলো নদীতে। পরে কিছু লোক ধরাধরি করে তুলে বাড়ির খোঁজ খবর নিয়ে লাশ নিয়ে আসে। বাড়ির লোকজন সবাই নির্বাক তাকিয়ে ছিল লাশ দেখে। জ্ঞান হারিয়ে তার বৃদ্ধা মাও মারা গেলেন, এরই সাথে দুজনের খবর দেযা হল। স্ত্রী পাগলের মত হয়ে গেলেন। এখন দুই মেয়ে নিয়ে তার বিধবা স্ত্রীর দুঃখের সংসার কাটছে ৩১ বছর ধরে।
আমি আমার নানুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, এই কাপুরুষ রাজাকারদের কারণে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের জীবন দিতে হয়েছে।

সূত্র: জ-৩৩১৫

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
জলি	**জাহান আরা বেগম**
কালীতারা মুসলিস গার্লস একাডেমী	কালিতারা বাজার, নোয়াখালী
দশম শ্রেণি, রোল : ৪৯	বয়স : ৬০

ফিরে পায়নি হারানো মানুষগুলোকে

আমার ফুফুর বাড়ির নাম হানিফ মিয়াজী বাড়ি। সেই বাড়ির পাশে হিন্দু বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায়ই গুলির শব্দ শোনা যেত। একদিন গুলিবর্ষণ শুরু হলে আমার ফুফুর মামা ফুফুকে এবং তার স্ত্রীকে ফুফুর নানার বাড়ি এসেছিলেন। সে সময় তাদের মনের মাঝে ভীষণ মৃত্যুভয় তাড়া করে বেড়িয়েছে। তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে বেড়িয়েছেন।
গুলিবর্ষণ শুরু হলে হিন্দু বাড়ির লোকজন ফুফুর বাড়ির কাছারিতে এসে আশ্রয় নিত। আর আমার ফুফুরা আশ্রয় নিত বাড়ির পেছনের জঙ্গলে। পাকবাহিনীর লোকেরা হিন্দুবাড়ির বেশ কয়েকজন লোককে মেরে ফেলেছিল। এ ছাড়াও তারা সেই বাড়ির মেয়ে এবং মহিলাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। তাদের এই অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভুঞাবাড়ির (হিন্দুবাড়ি) লোকজন একদিন পাকবাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল। তখন তারা তিনজন পাকিস্তানি সৈন্যকে মেরে ফেলে। সেই লাশ তিনটি রাস্তার পাশে এক সপ্তাহ পর্যন্ত পড়েছিল। যখন লাশগুলো থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল তখন লোকজন লাশগুলোকে মাটিতে পুঁতে ফেলেছিল। পাকবাহিনীর অত্যাচার সহ্য করে এবং মৃত্যু ভয়কে সঙ্গে নিয়ে ভুঞার হাট এলাকার লোকজন যুদ্ধের সময় অতিবাহিত করেছে। নয়মাস পরে দেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু কেউই ফিরে পায়নি তাদের হারানো মানুষগুলোকে।

সূত্র: জ-২৭৭১

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
নিলুফার ইয়াসমিন	**ফিরোজা বেগম**
মাকসুদাহ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	হানিফ মিয়াজী বাড়ি
দশম শ্রেণি	বয়স: ৫২

দেশটা আমার হলো না

একাত্তরে আমরা স্থানীয় কয়েকটা হিন্দু পরিবারের ৩৫ জন মানুষ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতের পথে যাত্রা করি। দলের মধ্যে ছিল অধিকাংশ নারী ও শিশু। তখন ভারত যাওয়ার রাস্তা ছিল মোটামুটি এ রকম– সোমপাড়া, খিলপাড়া, আমিষাপাড়া হয়ে বজরা রেল লাইন পার হওয়া। তো, প্রথম বিপদ হলো এই রেল লাইন পার হওয়া নিয়ে। তখন গুজব ছিল নোয়াখালী লাকসাম রেললাইন নিরাপদ রাখার জন্য সব সময় পাকবাহিনী ও রাজাকাররা পাহারা দিচ্ছে। রেললাইন যেহেতু সোজা ও সমান্তরাল সেহেতু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেক দূর দেখা যেত। রেলপথ পার হওয়ার উপায় ছিল দুইটা, হয় নৌকায় ব্রিজের নিচ দিয়ে অথবা পায়ে হেঁটে

রেল স্টেশনের উপর দিয়ে। মজার ব্যাপার হলো রাজাকাররা রেল ব্রিজ বা কালভার্টগুলোতেই পাহারা দিত আর থাকত রেল স্টেশনের বাইরে। রেল লাইনের এক দিকে ছিল খালি জমি অন্যদিকে ষ্টেশন সময়টা ছিল বর্ষাকাল। সর্বত্রই পানি থৈ থৈ করছে। বজরা পার হতে পারলেই কাজিরহাট। কানকির হাট থেকে সাতবাড়িয়ার বিশাল জলাভূমি পার হয়ে বকসনগর বাগগ্রাম, দরবেশের হাট পর্যন্ত নিরাপদ। এর পরই দ্বিতীয় বিপজ্জনক স্থান হলো গুণবতী রেল লাইন পার হওয়া এবং তৃতীয় ও সর্বশেষ বিপজ্জনক স্থান হলো ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক বা বিশ্বরোড। এর পরেই ভারতের অভ্যন্তরে নিরাপদ আশ্রয়। তখন এই পথটুকু পার হতে দুই তিনদিন বা কোনো বিপদ ঘটলে ৫-৬ দিনও লেগে যেত।

ভারতের কিনপুর তেলিয়াঘুরা হয়ে চোত্তাখোলা, রাজনগর ও আগরতলা। চোত্তাখোলায় তখন একটা শরণার্থী ট্রানজিট ক্যাম্প ছিল। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার কৃষ্ণ বাবু নামে এক ভদ্রলোকের একিনপুরে একটি দোকান ছিল। তিনি ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন। তো, আমরা বজরা রেলপথ নিরাপদে পার হয়ে বাকি পথও পাড়ি দিয়ে গুণবতী রেললাইন পার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ খবর এলো, 'আইয়ে, পাকসেনারা আইয়ে।' সুতরাং যে যার মতো দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। আসলে এতো বছর পরে তখনকার প্রকৃত দৃশ্যটা বা মনের অবস্থাটা বুঝানো যাবে না। এখন যতই বলি না কেন বা তোমরা যতই লেখ না কেন বাস্তবটা উঠে আসবে না। কারণ বিষয়টা অনুভূতির ব্যাপার।

আমি দলের অনেক আগে। কারণ আমার মূল্যবান গয়নাগাটি, কাপড় চোপড়সহ ছয়টা ট্র্যাংকে মালপত্র মুটেদের মাথায় দিয়ে পার হচ্ছি। তখন সীমান্ত এলাকার এই সব মুটেরা টাকার বিনিময়ে মানুষের মালামাল এমন কি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা মানুষদেরও বহন করে পার করতো। মালপত্রসহ রেললাইন পার হওয়ার পরই শুনলাম আমার লোকজন বিপদে পড়েছে। এদিকে দৌড়াদৌড়িতে আমার মুটেরা কে কোথায় পালাল ঠিক করতে পারলাম না। আমি শুধু একজন মুটের পিছনে দৌড়ালাম। তখন বাকি দুইজন মুটের মাথায় থাকা চারটা ট্রাংক চিরতরে হারিয়ে গেল। দুইটা ট্রাংক নিয়ে যখন একিনপুর বাজারে পৌঁছলাম তখন আমার মনের অবস্থা বলে বুঝানো যাবে না। কারণ মালামাল হারানো ছাড়াও আমার পরিবারের সদস্যদের কি হয়েছে তাও জানি না। তখন বিকাল হয়ে গেছে, বৃষ্টি আসন্ন। আমার চেহারা দেখে কৃষ্ণ বাবু একটা লোককে ডেকে বললেন, তুমি ওনার সঙ্গে যাও। যেখানে যেতে বলেন সেখানেই যাবে। সেই সন্ধ্যায় আবার বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করে যখন বাগগ্রামে পৌঁছলাম তখন রাত্র। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগলো। বাজারের মানুষের নানা কথায় মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে বৃষ্টি মাথায় ঈশ্বরের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

দরবেশের হাট পার হওয়ার পর খবর পেলাম যে দুপুরে একদল শরণার্থীর উপর হামলা হয়েছে। আর একজন শিশু মারা গেছে। তাতে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। তবে বকস নগর এসে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলী আকবর মিয়ার নিকট সঠিক তথ্যটা পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। সেখানেই খবর পেলাম ৩৫ জনের দলটা নিরাপদ আছে, কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে একটা শিশু ঠাণ্ডাজনিত কারণে মারা গেছে। তিনি আরও জানালেন যে, এতোজন লোক এখানে রাখা নিরাপদ নয় বলে তাদেরকে কানকির হাট মগবাড়িতে স্থানান্তর করা হয়েছে। তারা সেখানে আছে। আমি তখন সঙ্গিসহ সেখানে রাত্রিযাপন করে সকালে সঙ্গীটাকে কৃষ্ণবাবুর নিকট ফেরত পাঠালাম এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হলাম।

পরদিন সেখানে মেজর সি আর দত্ত এসেছিলেন। ঘটনা শুনে তিনি স্থানীয়ভাবে চাঁদা সংগ্রহ করেন। মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় আমাদেরকে ভারতে পার করার ব্যবস্থা করেন এবং পাঁচ দিন খাদ্য, আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। ছয় দিনের মাথায় ভারত পৌঁছালাম মূল্যবান সোনদানা হারিয়ে। যদিও জীবনের নিরাপত্তা পেলাম; কিন্তু পুরো তিন মাস শরণার্থী ক্যাম্পে নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাটিয়ে স্বাধীন দেশে ফিরে এলাম।

কিন্তু আফসোস! দেশটা আমার হলো না। যে রাজাকার সেদিন দেশের মানুষের ক্ষতি করেছে ৩৫ বছর পর সেই রাজাকার স্বাধীন দেশের মন্ত্রী। স্বাধীনতার পতাকাশোভিত গাড়িতে চড়ে তারা ঘুরে বেড়ায়!

সূত্র: জ-৭৩৪৭

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
ফাতেমাতুজ জোহরা	**হারাধন দাশ**
সোমপাড়া হাই স্কুল	গ্রাম : গোপাইর বাগ, ডাক: সোমপাড়া
৯ম শ্রেণি, রোল : ২১	থানা : চাটখিল, জেলা : নোয়াখালী

হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলছে

১৯৬২ সাল থেকে সোনাইমুড়ী বাজারে আমাদের একটি দোকান ছিল। ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী লাকসাম থেকে মানুষের ঘরবাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দিয়ে গুলি করতে করতে এগিয়ে আসে। এবং সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। লাকসামের আকাশে শুধু কালো ধোঁয়া দেখা যায়। তারপর আমার বাবা ও সোনাইমুড়ী বাজারের সকল লোক পালিয়ে যায়। আসার সময় আমাদের দোকান থেকে বাবা কিছু মালামাল বাড়িতে নিয়ে আসেন। যুদ্ধ চলাকালীন পাকহানাদার বাহিনী সোনাইমুড়ী বাজারে এসে আমাদের দোকানসহ বাজারের অন্যান্য দোকানগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এতে সব দোকানপাট পুড়ে যায়। আমার বাবা জীবনের ঝুকি নিয়ে দোকান দেখতে যেয়ে দেখেন সমস্ত দোকান পুড়ে গেছে এবং আমাদের দোকানের ভিটাতে হানাদার বাহিনী তৈরি করেছে একটি বাংকার। তারা সোনাইমুড়ী বাজারে অগ্রণী ব্যাংকের উপর আরো একটি বাংকার তৈরি করে। বাহিনী সোনাইমুড়ী বাজারের হাই স্কুল ও অগ্রণী ব্যাংকের ভিতরে থাকতো। তিনি আরো দেখেন যে, মুক্তিবাহিনী সোনাইমুড়ী বাজারের উত্তরে রেলের একটি ব্রিজ ডিনামাইট দ্বারা উড়িয়ে দিয়েছে। পাক হানাদার বাহিনী ব্রিজটি পরে মেরামত করে। কিছুদিন পর আমার বাবা নদনা বাজারে একটি মুদি দোকান দেন।

প্রায় এক মাস পর হঠাৎ করে পাকহানাদার বাহিনী রাজাকারসহ নৌকায় করে নদনা বাজারে এসে বাজার দখল করে নেয় এবং বলতে থাকে, তোমরা শান্তি কমিটি গঠন করো। এরপর আমার বাবাকেসহ বাজারের প্রায় ৭০ জন মানুষকে সিরিয়ালে দাঁড় করায়। সেই লাইনের সামনে একটি বড় মেশিনগান ফিট করে। এটা দেখে সবাই কলেমা পড়তে থাকে। একজন হানাদার একের পর একজন জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'তোম হিন্দু না মুসলিম হায়।' আমার বাবা দেখেন যে রাজাকাররা আমাদের ও অন্যান্য দোকানের মালামাল নিয়ে যাচ্ছে। তিনি একজন হানাদারকে বলেন যে, আপনাদের লোক আমাদের দোকানের মালামাল নিয়ে যাচ্ছে। এই কথা শুনে পাক হানাদার বাহিনীর কমান্ডার আয়ুব আলীকে জিজ্ঞেস করলো যে, সে কি বলেছে? তখন লোকটা আমার বাবার কথা তাকে উর্দুতে বুঝিয়ে দিল। লোকটাকে পাকহানাদার বাহিনী বাংলা ভাষা বোঝার জন্য রাখতো। এরপর তারা আমার বাবাকেসহ সবাইকে ছেড়ে দেয়। কমান্ডার রাজাকারদের বলে আমার বাবাসহ সবার লুটের মাল ফেরত দিতে। কিন্তু রাজাকাররা সামান্য মাল ফেরত দিয়ে বাকি সব নিয়ে যায়। এরপর পাকহানাদার বাহিনী ও রাজাকাররা নদনা বাজার থেকে চলে যায়। যাওয়ার আগে তারা ক'জন মানুষকে হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়, এতে সবাই মারা যায়।

সূত্র: জ-২১২৬

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মোঃ সাইফুল ইসলাম	**মো: তোফাজ্জোল হোসেন**
সোনাইমুড়ী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : সাট্রারা, ডা : সরসপুর
১০ম শ্রেণি, খ শাখা, রোল : ৮৬	থানা : লাকসাম, জেলা : কুমিলা
	সম্পর্ক : পিতা

সহপাঠী ফিরলো না

মায়ের মুখে শুনেছি বাবা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি কলেজে পড়া অবস্থায় তার সহপাঠীদের নিয়ে বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে ইন্ডিয়া চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে কমান্ডার পদে নিযুক্ত হলেন। বাবা বলেন,

যুদ্ধের দিনগুলো ছিল অনেক কষ্টের। কত দিন না খেয়ে কাটিয়েছি। কত রাত না ঘুমিয়ে থেকেছি। জঙ্গলে মশার কামড় ও বিষাক্ত পোকা মাকড়ের কামড় খেয়েছি। এত কষ্টের ভেতরেও এই ভেবে মনে শান্তি ছিল যে একদিন দেশ স্বাধীন হবে।

দেশে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন আমার মায়ের বয়স ছিল সাত বছর। তিনি এই ভয়ানক যুদ্ধের কিছুই বুঝতেন না। একদিন সকাল বেলা তিনি বাইরে খেলাধুলা করছিলেন। হঠাৎ একদল মুক্তিবাহিনী এসে তাকে ডাক দিয়ে বলল। এই যে খুকি এদিকে আসো। আমার মা ভয়ে কান্না শুরু করেন। তারা আমার মাকে আদর করে বলল, আমাদের ভয় পেও না খুকি। তুমি তোমার মা বাবাকে একটু ডাক। মা এক দৌড়ে ঘরে গিয়ে নানা-নানুকে ডেকে নিয়ে এলেন। তারা নানুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মা, আমরা মুক্তিবাহিনী। আমরা আজ তিন দিন ধরে কিছু খাইনি। আমাদের কিছু খেতে দিন। নানু তখন ঘরে গিয়ে তাদের জন্য গুড়-মুড়ি নিয়ে এলেন। তারা খেয়ে চলে গেলেন।

যুদ্ধের তখন শেষ পরিস্থিতি। আমার বাবা ও তার সহপাঠি কমান্ডার তাদের দল নিয়ে সোনাইমুড়ি এসে জানতে পারলেন সেখানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আরো দুটি ক্যাম্প আছে। একটা সোনাইমুড়ি হাই স্কুলে আর একটা সোনাইমুড়ি রেলস্টেশনে। তখন আমার বাবা গেলেন রেল স্টেশনে। আর ওনার সাথের কমান্ডার গেলেন হাই স্কুলে। স্টেশনে ছিল অনেক দোকান ঘর। তিনি একটা ঘরের কাছে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়াতেন। চট করে একটা ঘর পার হয়ে আরেকটা ঘরের কাছে যেতেন। এভাবে তিনি সবগুলো ঘর পার হয়ে পাকিস্তানিদের আচমকা আক্রমণ করে তাদের ক্যাম্প ধ্বংস করে দিলেন। তারপর তিনি হাই স্কুলের দিকে রওনা হলেন। হাই স্কুলে এসে দেখেন পাকিস্তানিরা মাঠের মাঝখানে গর্ত করে লুকিয়ে আছে। তিনি স্কুলে গিয়ে মাইক দিয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের পালাবার পথ নেই। তোমরা আত্মসমর্পণ কর। পালাবার পথ না পেয়ে তারা সবাই আত্মসমর্পণ করলো এবং গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু একটা পাকিস্তানি গর্তের ভিতর বন্দুক নিয়ে বসে রইল।

মুক্তিবাহিনীর দল যখন পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে গেল তখন গর্তের ভেতরের হিংস্র নরপশুটা বের হয়ে সহ-কমান্ডারের বুকে গুলি করে ঝাঝরা করে দিল। আমার বাবা যখন স্কুলে আসার পথে তখন আমার বাবার কানে গুলির শব্দ শুনলেন। দৌড়ে এসে তিনি দেখলেন তার সহ-কমান্ডার মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। বাবার মাথায় রক্ত উঠে গেল। তিনি তখন পাকিস্তানিদের সবার বুক গুলিতে ঝাঝরা করে দিলেন। তারপর সহ-কমান্ডারের কাছে এসে দেখলেন তিনি শহীদ হয়েছেন। আমার বাবার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এই ভেবে যে, এত মাস এক সাথে যুদ্ধ করে যখন স্বাধীন বাংলার মুখ দেখবেন তখন তার সহপাঠীকে তিনি হারালেন। দু'জনে মিলে যুদ্ধের সময় কত স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। স্বাধীন বাংলার বুকে তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবেন। অনেক দিন পর তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করতে পারবেন। কিন্তু সহ-কমান্ডারের এ স্বপ্ন পূরণ হতে দিল না পাক হানাদাররা।

যুদ্ধ শেষ হলো। আমার বাবা তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে এলেন বীরের মত স্বাধীন বাংলার পতাকা হাতে নিয়ে। কিন্তু তার সহপাঠী ফিরলো না।

সূত্র: জ-২১৫৩

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
তামান্না আখতার	**নাজমুন নাহার**
সোনাইমুড়ী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	মা
অষ্টম শ্রেণি, এ শাখা, রোল : ২৬	

কাকা পুকুরে লাফ দিলেন

আমার বয়স তখন ১৬-১৭ বছর। আমরা তিন ভাই। আমার বাবা মাইজদীতে সরকারি চাকরি করতেন। সে সময় চারদিকের অবস্থা খুব খারাপ। আমাদের পরিবারে খুব অভাব দেখা দেয়। এজন্য আমার বাবার কাছে যেতে হবে টাকার জন্য কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না যে কীভাবে যাব; কারণ চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের কাহিনী। তারপরও আমি সিদ্ধান্ত নিলাম বাবার কাছে যাব। মাকে এ কথা জানালাম। মা ভয় পেয়ে গেলেন। যেতে দিলেন না। আমিও মায়ের কথা রাখতে গিয়ে আর গেলাম না। পরের দিন সকালে আবার মায়ের কাছে গেলাম। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। তাই মাকে না বলে সকাল ৮টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম বাবার উদ্দেশে। কিছুদূর গিয়ে শুনতে পেলাম পাকিস্তানি হায়নার দল নির্মমভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে। এমনকি আমাদের গ্রামেও আসতে পারে। তারপরও আমি হাঁটতে লাগলাম। দেড় কিলোমিটার যেতেই আমার সামনে একটি জিপ এসে দাঁড়াল। আমি নিজে থেকে চমকে উঠি এবং আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে পড়ি। কয়েকজন হানাদার জিপ থেকে নেমে আমার সামনে আসে। জিজ্ঞেস করে আমি মুক্তি কি না।

আমি কিছুই বললাম না বিধায় আমাকে তারা রাগান্বিত হয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, শালা কোথায় যাচ্ছিস? তখন আমি বললাম, আমার বাবার কাছে। তারা ভাবল আমি মিথ্যা বলছি। তখন আবার জিজ্ঞেস করল, তোর বাবা কোথায় কি করে? আমি বললাম মাইজদীতে সরকারি চাকরি করে। তাদের একজনের হাতের রাইফেল দিয়ে আমার এক পাশে একটা বাড়ি দিল। আমি ভীষণ ব্যথা পেলাম। আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তারা আমাকে একটা ধাক্কা মেরে চলে গেল। আমি ব্যথার জন্য আর হাঁটতে পারলাম না। অনেকক্ষণ পাকা রাস্তায় বসে রইলাম। চার পাশের কোথাও তেমন লোক দেখা যায় না। অনেক কষ্ট করে আমি উঠে বাড়ির উদ্দেশ্য রওনা দিলাম, বাবার কাছে সেদিন আর যাওয়া হলো না। আসার সময় শুনলাম আমাদের পাশের গ্রামে তারা আক্রমণ চালিয়েছে। অনেক মানুষকে খুন করছে এবং অনেক মানুষকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হলো আমাকেও তো তারা মেরে ফেলতে পারতো। আল্লাহ বুঝি আমাকে বাঁচাল, এই কথা ভেবে আমার শরীর শিউরে উঠল। আমি অনেক কষ্টে বাড়ি ফিরে এলাম। মা আমাকে ধরে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। আমি মাকে কাঁদতে বারণ করলাম।

সেই সময় গ্রাম থেকে অনেক লোক পালাতে লাগলো। তারা চিৎকার করে বলছে, পাকিস্তানি হানাদাররা আসছে। আমি বুঝতে পারলাম কুত্তারা আমাদের গ্রামেও আক্রমণ চালাবে। এর মধ্যে কয়েকজনকে রাস্তায় ধরে মারধরও করছে। মা আমাকে খাটের নিচে লুকিয়ে ফেলে। আমি দেখছি হায়নার দল আমাদের বাড়ির দিকে আসছে। আমাদের দুটি ঘর ছিল। একটি পূর্ব ভিটার আর একটি পশ্চিম ভিটায়। শত্রুরা পশ্চিম ভিটায় দরজার সামনে এসে দাঁড়ালে আমার মা পথ আটকিয়ে দাঁড়ায়। তারা আমার মাকে জিজ্ঞেস করে, তোর স্বামী কোথায়? আমার স্বামী বাড়িতে নেই, মা জবাব দেয়। আমার একটা ছবি ছিল বেড়ার সাথে ঝুলানো। তারা রাইফেলের মাথা দিয়ে সেটাকে নিচে ফেলে দেয় এবং সেই বুট জুতা দিয়ে চুরমার করে ফেলে। আমাদের গোলায় প্রচুর পাট ছিল। তারা আমাদের গোলার দিকে উঁকি মারে। আমার মাকে বাতি দেওয়ার জন্য বলে। মা উত্তর দিল, আমাদের বাতি নেই। কি নিয়ে থাকিস বুড়ি বলে মাকে একটি গালি দিল। তারপর তারা ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার সময় মাকে বলে যায়, তোর স্বামী এবং ছেলেকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিবি কালকে। যাওয়ার সময় আমাদের গ্রামের অনেক বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

পরের দিন তারা আবার আমাদের পাশের গ্রাম আক্রমণ করে। সেই গ্রামে ঢুকে তারা আব্দুল লতিফ কাকাকে ধরার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। কারণ তিনি ছিলেন শিক্ষিত। তিনি সবাইকে দেশের অবস্থার কথা জানাতেন। রুখে দাঁড়াতে বলতেন এবং সবাইকে সচেতন করতেন। এই খবর তারা কীভাবে পেয়ে গেল। আবদুল লতিফ কাকা সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠে ফরজ নামাজ আদায় করেছেন। তার সামনে পিঠা এনে দেয়া হল।

তৎক্ষণাৎ তারা ঢুকে পড়ল। কাকাদের ঘরে বস্তায় বস্তায় অনেক ধান ছিল। শয়তানরা সে গুলোকে ছিটিয়ে নষ্ট করে ফেলে এবং কাকাকে ধরে নিয়ে চলে যায়। আমরা সবাই তাকিয়ে রইলাম। প্রায় আধ মাইল যাওয়ার পরে কাকা একটা পুকুরে লাফ দিলেন। নাম ছিল বড় পুকুর। শয়তানরা তাকে লক্ষ করে একের পর এক গুলি করতে

লাগল। কিছুক্ষণ পর আর কোনো শব্দ পেলাম না। তারা চলে গেলে সবাই মিলে লাশ খুঁজতে আরম্ভ করলাম। পুকুরের উত্তর পশ্চিম কোণায় লাশ পাওয়া গেল। তার লাশ সবাই মিলে বাড়িতে আনল এবং দাফন করা হলো। তিনি অমরত্বের সাথে শহীদ হলেন পাক হানাদারদের হাতে।
যারা আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রাণ দিলেন তারা প্রত্যেকেই আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। তাদের কথা আমরা কোনো দিনও ভুলবো না।

সূত্র: জ-২১৭২

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
পারভীন আক্তার	**মোঃ আব্দুল কালাম**
সোনাইমুড়ী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : কৈয়া, ডাক ও থানা : সোনাইমুড়ী
দশম শ্রেণি, বাণিজ্য বিভাগ, রোল : ২২	জিলা : নোয়াখালী
	বয়স-৫৮

এটা হবে জাতির সাথে বেঈমানি

সম্ভবত সেদিনএপ্রিল মাসের ২০ তারিখ হবে। আমরা ৩০-৩৫ জন কলেজ ছাত্র কবিরহাট কলেজ মাঠে একত্রিত হই। সময় কবিরহাটে রাজাকার আসেনি। চৌমুহনী কলেজের মোস্তাফিজ ভাই রাজনৈতিক বক্তব্য দেন। আর সংক্ষিপ্তভাবে ফারুক ও শরবত আলী কিছু বলেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন যুদ্ধে কে কে যাবে? মরণের জন্য প্রস্তুত কে? এর জবাবে প্রথমে আমি, ফারুক হোসেনসহ ৫ জন উঠে দাঁড়াই। আরও কয়েকজন এরপর দাঁড়ায়। পরের দিন সকালে বাড়ির কাউকে না বলে রওনা হই। আমাদের বলা হয়েছিল সেনবাগের কানকীরহাটে বিকাল ৪ টার ভেতর পৌঁছবার জন্য।
বাটাইয়া দিয়া যাওয়ার সময় দেখি আমার বন্ধু জায়দল হক সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, ফুফুর বাড়িতে যাচ্ছি কুতুবের হাটের কাছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনে কোথায় যান? আমি বললাম, মামার বাড়িতে যাচ্ছি। নিরাপত্তার জন্য উভয়ে সত্য কথা বললাম না। অনেক্ষণ হাঁটার পর সত্য কথা বলা হলো। আমরা মুন্সীর হাটের কাছে গেলাম। দেখি, বড় রোড দিয়ে রাজাকার টহল দিচ্ছে। আমাদের হাতে থলে ছিল। তাদের সন্দেহ হবে বলে একটা দোকানে বসে গুলগুলা খেলাম। রোডে গিয়ে এদিক সেদিক দেখে তারপর সরে পড়ি। বিকাল ৪ টার সময় আমরা কানকীর হাট পৌঁছি। কাউকে দেখি না। প্রায় আধ ঘন্টা বসার পর চতুর্দিক থেকে তরুণ যুবক ছেলেরা এসে হাজির হয়। আমরা ২০০/২৫০ জন হয়ে কুমিল্লার দিকে রওনা হই। একটা বাজারে রাত্রে থাকি। পরের দিন জগন্নাথ দিঘীর কাছে এক বাড়িতে থাকি। বাড়ির লোকেরা আমাদের খাবার দেয়। রাত্রে সিও কোয়ার্টার-এর কাছে পৌঁছলে হানাদার বাহিনী লাইট দিয়ে দেখে। হঠাৎ আলো আসলে আমরা সবাই শুয়ে পড়ি। তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। তারা আমাদের দেখতে পারেনি।
আমরা ভারতে প্রবেশ করে চোত্তাখোলা ক্যাম্পে যোগদান করি। সেখানে আমাকে বিষধর সাপে কামড় দিয়েছিল। এক ভারতীয় ক্যাপ্টেন আমার চিকিৎসা করেন এবং আমার বিষ নামান। আগরতলা নিয়ে চিকিৎসা করান। তারপর আমরা ক্যাম্পে যাই এবং গেরিলা ট্রেনিং নেই। ট্রেনিং শেষে আমরা দেশে প্রবেশ করি। বানজির হাট কেশবপাড়া স্কুলে এক মাস থাকি। সেখান থেকে আমার গ্রুপের ১৯ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে সেনবাগ রাস্তায় দাগনভুঁইয়া ও চৌমুহনী সড়ক বরাবার হানাদার বাহিনীর গাড়ি চলাচলে আক্রমণ করি। কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারতাম না। কারণ একজন দালাল এই খবর হানদারদের পূর্বেই দিয়ে দিত। হানাদাররা পরে এসে আশপাশের বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলত।

ওই লোকটাকে আমরা একদিন ধরে ফেলি। জীবন বাঁচানোর জন্য তার লোকেরা আমাকে তখন ৫০ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি বলেছিলাম, এটা হবে জাতির সাথে বেঈমানি। তাকে আমরা মেরে ফেলি। তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে আমরা সেখানে রেখে ১৬ জন কবিরহাট এলাকায় চলে আসি। এই তিনজনের বাড়ি ছিল সেনবাগে। আমরা এখানে এসে তালমোনদের হাট রাজাকার ক্যাম্প এবং মাইজদি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করি। এভাবে একদিন নোয়াখালী শত্রুমুক্ত করি।

সূত্র: জ-৩৮৫৬

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
তানবীর আহম্মদ	**আবদুল আউয়াল**
সৌদিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	
৪র্থ শ্রেণি	